কিশোর গ্রন্থাবলী

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

আমার পরম হিতকামী
সাহিত্যরসিক স্নেহভাজন
শ্রী সুপ্রিয় সরকারকে
এই গ্রন্থ উৎসর্গীত হইল।

সূচী

উপন্যাস

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়

এক

গোয়ার্ণসি ইংলিশ চ্যানেলের একটি দ্বীপ। আমাদের গল্পের ঘটনা ঘটেছে সেইখানেই। চ্যানেলের দ্বীপগুলি যদিও ইংলণ্ডের অধিকারে, তবু এরা ফ্রান্সেরই কাছাকাছি। গ্র্যানাইট্ পাথরের তৈরি এই গোয়ার্ণসি দ্বীপ, উত্তর দিকে এর বালিয়াড়ি আর দক্ষিণে খাড়া পাহাড়। নিচু তটের দিকটা বাঁধ দিয়ে ঘেরা, কিন্তু সমুদ্র চিরদিনই সেই প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে তার বুকে হানা দিয়েছে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেমন ছাই উড়ে আসে, তেমনি ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্স থেকে অনেকে পালিয়ে এসে এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল একটি মেয়ে, নাম তার গিলিয়াট। খুব সামান্য টাকাকড়ি সঙ্গে ছিল তার, তাই দিয়ে ছোট্ট ভাঙা একটা বাড়ি সে কিন্‌ল। বাড়ির সঙ্গে লাগাও এক টুকরা জমি। পোড়োবাড়ি, বহুদিন মানুষের বাস নেই সেই বাড়িতে, ভুতুড়ে বলেই তার ছিল প্রসিদ্ধি, কাজেই খুব সস্তাতেই সেটা পাওয়া গেল।

বাড়িটার নাম বুস্তলারু, একটা ছোট বন্দরের কাছে, মাঝে আড়াল করে আছে একটা পাহাড়। বাড়ির মধ্য থেকে খানিকটা জায়গা নিচু হয়ে নেমে গেছে সোজা সমুদ্রের মধ্যে, অনেকটা ছোট্ট অন্তরীপের মতো। জেলেরা তাদের ডিঙি বাঁধত সেই জায়গায়।

একমাত্র ছেলে ছাড়া মেয়েটির আর কেউ ছিল না পৃথিবীতে। কিন্তু ছেলেটি যুবক হয়ে ওঠবার আগেই সে মারা গেল। ছেলেকে দিয়ে গেল সেই

বাড়িটা, তার সংলগ্ন জমির টুকরোটুকু এবং একশোটি মোহর। তরিতরকারী বাজারে বিক্রি করে, এই টাকাটা তাদের জমেছিল দু'জনের পরিশ্রমে।

এছাড়া ছেলেকে দিয়ে গেল পুরনো চামড়ার একটা স্যুটকেস, তাতে ছিল বিয়ের কনের পোশাক।

সেই সঙ্গে একটা কাগজে লেখা, "তোমার বউয়ের জন্য,—বড়ো হয়ে যখন তুমি বিয়ে করবে।"

ছেলেটির নামও গিলিয়াট, লম্বা চেহারা, গায়ে খুব জোর, দেখতেও বেশ সুশ্রী, উজ্জ্বল মুখ, আর পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁত।

মা মারা যাবার পর গিলিয়াট মাছ ধরার ব্যবসাতে মন দিল। ও অঞ্চলে ওর মতো নৌকা চালাতে মজবুত লোক আর ছিল না। সমুদ্রতলের সমস্ত ম্যাপ, ছিল তার নখের আগায়, তার মধ্যেকার সমস্ত পাহাড় পর্বত ছিল যেন তার মুখস্থ, এবং যেমন ছিল সে বলবান তেমনি বাহাদুর—তার নৌকাও ছিল তেমনি প্রকাণ্ড আর ভারী। সেই নৌকাকে সে সুকৌশলে সমুদ্রের সব বিপজ্জনক জায়গা দিয়ে অবহেলায় চালিয়ে নিয়ে যেত।

এখন আসল গল্পের মধ্যে আসা যাক। ক্রীশমাসে, একদিন গোয়ার্ণসিতে বরফ পড়ল। আশ্চর্য ব্যাপার! ওই দ্বীপে খুব কদাচই এরকম ঘটেছে। শুধু বরফ পড়া নয়—রাস্তা ঘাট মাঠ সমস্ত জায়গা জুড়ে বেশ কয়েক ইঞ্চি পুরু তুষার জমে গেল। সবে সকাল ন'টা। তখনও গির্জায় যাবার সময় হয়নি। সেন্ট স্যাম্পসনে যাবার রাস্তায় দু'জন পথিককে দেখা গেল সেই সময়ে।

তুষারপাত হয়ে গেলেও সকালটা ছিল চমৎকার। আগে আগে যাচ্ছিল একটি মেয়ে, বয়স হবে তার ষোলো, গায়ে তার কালো সিল্কের পোশাক, তার ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছিল সাদা আইরিশ পপ্‌লিনের ফ্রক্, আর তার পায়ে ছিল গোলাপী মোজা। প্রকাণ্ড হ্যাটের তলা থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া যায়, তা' থেকে মনে হয় মুখখানি সুন্দর। তাকে অনুসরণ ক'রে প্রায় একশ' হাত দূরে দূরে যাচ্ছিল একটি ছেলে।

ছেলেটির বয়স হবে বছর পঁচিশ, তার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে মনে হয় সে মজুর, অথবা নাবিক। গির্জাই যে তার গন্তব্যস্থান, তা' ঠিক বলা যায় না। গায়ে তার মোটা জার্সি, পায়ে তার পুরু চামড়ার জুতো, তার সোলে বড় বড় পেরেক।

হঠাৎ মেয়েটি ফিরে তাকাল, তাকিয়ে থামল খানিকক্ষণ। ঝুঁকে পড়ল মাটির দিকে, কি যেন লিখল পায়ের আঙুল দিয়ে নরম তুষারের ওপর।

ছেলেটিও দাঁড়িয়ে পড়ল, দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। এবং যখন মেয়েটি আরেকবার ফিরে তাকাল, একটুখানি হেসে আবার চলতে সুরু করার আগে, তখন ছেলেটি চিনতে পারল মেয়েটিকে। মেয়েটি যে লেথিয়েরির ভাইঝি, যিনি থাকেন সেণ্ট্ স্যাম্পসনে। মেয়েটির নাম দেরুশেৎ।

চিনতে পারল বটে, কিন্তু ভাবল না সে কিছুই, তেমনি ঘাড় হেঁট করে রাস্তার দিকে চেয়ে সে চলতে লাগল, যেমন হাঁটা তার চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু মেয়েটি যেখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে পৌঁছেই তাকে চমকে উঠতে হলো। তুষারের উপর লেখা যে তারই নাম,—গিলিয়াট! তা'হলে মেয়েটি তাকে চেনে। ভাবনার কথা তো!

দেরুশেৎ চলে গেল তার পথে। তার সামান্য কৌতুকের কথা সে ভুলেই গেল। প্রতি মুহূর্তেই তার মনের রঙ্ বদলে যাচ্ছে, যেমন বদলায় আকাশের মেঘ। তুষারের বুকে গিলিয়াটের নাম গলবার ঢের আগেই তার মন থেকে মুছে গেছে সে কথা। কিন্তু গিলিয়াটের পক্ষে ভোলা ততো সহজ হলো না।

হ্যাঁ, ঐ বরফের লেখা গিলিয়াট সহজে ভুলতে পারল না। সে তো আর ছেলেমানুষটি নয়, এখন সে বড়ো হয়েছে, যুবক হয়েছে, তার হৃদয়ে এসেছে গভীরতা। সে রাত্রে ঘুম এল না তার চোখে।

দুই

দেরুশেতের কাকা যে লেথিয়েরি লোকটি খুব চমৎকার। এখন তাঁর পা ঘাটের কোঠায়, কিন্তু বছর দশেক বয়স থেকেই সমুদ্রের দিকে তাঁর টান। যখনই কোন জাহাজ-ডুবির আশঙ্কা হয়েছে, তখনই তার উদ্ধারের কাজে সর্বাগ্রে দেখা গেছে লেথিয়েরিকে। বিপন্ন জাহাজ দেখবামাত্র তিনি জানতে পারতেন সেটা কোন্ জাহাজ এবং সম্ভব হলে তখনি লোক যোগাড় করতে লেগে যেতেন। আর কোন সাহায্যকারী পান আর নাই পান নিজেই তিনি ছুটে যেতেন অবিলম্বে, তা' সমুদ্র তখন উত্তালই হোক বা ভয়ানক ঝড় বয়েই চলুক।

কিন্তু সম্প্রতি ষাটের কোঠা পেরিয়ে তাঁকে ধরেছে বাতে, সেই জন্যে দৌড়-ঝাঁপের ব্যাপারে আর থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া ইতিমধ্যে বিত্তশালীও হয়ে পড়েছেন তিনি। তাই এখন তিনি সর্বদাই ঘরে বসে থাকেন,

লোককে হুকুম করেই কাজ চালান। কিন্তু সমুদ্রের ওপর টান তাঁর যায় নি, টেলিস্কোপ নিয়ে সমুদ্রকে লক্ষ্য করা এখনও তাঁর অভ্যাস। হয়তো কখনো একটা বই খুলেও বসেন—যদি তাঁর পড়ার ইচ্ছা হয়। সে বইও, সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় হয়তো তাদেরি কোন কাহিনী।

যে লেথিয়েরি বিবাহ করেন নি। বোধ হয় তাঁর বরপণের অনেক দাবি ছিল। মেহগনি কাঠের মত রঙ্ ছিল তাঁর বিশাল দুই বাহুর। এক ঘুষিতে একটা থান ইট ভেঙে ফেলতে পারতেন তিনি। কিন্তু মেয়েদের হাত কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। মেয়েদের হাত হবে ছোট ছোট ধবধবে, তার আঙুলগুলি হবে লতানে আর নখগুলি ঝক্‌ঝকে। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল খুব উদার, আর প্রত্যেকের উপরই ছিল তাঁর প্রবল বিশ্বাস। যখন তিনি প্রতিজ্ঞা করতেন, তখন বলতেন, "ভগবানকে আমার কথা দিচ্ছি"। তাঁর সে কথার কোনোদিন নড়চড় হতো না। তাঁর মুখ ছিল প্রকাণ্ড, দেখলে মনে হতো অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা তাঁর উপর দিয়ে গেছে আর সে-সবের দাগ রেখে গেছে তাঁর মুখে। কিন্তু সেই কঠোর আকৃতির মানুষটির চোখের দৃষ্টি ছিল কি কোমল! হৃদয়জোড়া তাঁর অগাধ ভালবাসার পাত্র ছিল দু'জন—দেরুশেৎ আর দুরাঁদ।

দেরুশেৎ ছিল ঠিক পাখীর মত। ঘরে ঘরে সে যেন উড়ে বেড়াতো হালকা ডানায় ভর দিয়ে। তার চুলগুলি আঁচড়ালে দেখাতো ঠিক পাখীর পালক। কখনো সে গান গাইছে, কখনো সে কলরবে মুখর। হাসিখুশিতে সব সময়েই যেন সে ঝলমল করছে।

যারা বার্ধক্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং জীবনে যারা অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, এমনি একটি আনন্দের প্রতিচ্ছবি তাদের প্রতিনিয়ত প্রয়োজন। বিরাট গহন অরণ্যানীর কী অর্থ ছিল যদি না পাখীর গুঞ্জনে তা' মুখরিত থাকত সব সময়ে।

দেরুশেতের গায়ের রঙ্ ছিল তুষারের মতই শুভ্র, বসন্তের আমেজ লেগেই যেন ঈষৎ গোলাপী। তার গাল দু'টি ছিল আপেলের মত রাঙা আর নীল দুটি চোখ। আখ্‌রোটের মত ঢেউ খেলানো ঘন তার চুল। তার মুখ ছিল একটু বড়ই, কিন্তু সেই সুন্দর মুখের হাসিটি ছিল যেমন সরল, তেমনি মিষ্টি। আর হাত? হাত দু'টি ছিল ধবধবে, আঙুলগুলি লতানে আর ঝকঝকে নখ—যেমনটি তার কাকা চান। লেথিয়েরি তাকে কোন কাজ করতে দিতেন না, পাছে তার অমন চমৎকার হাতে ময়লা লাগে।

আর ডুর্‌াঁদ? সে ছিল লেকশেভের—একেবারে উল্টো। যেমন বিপুল চেহারা, তেমনি ভারিক্কী, তেমনি ভয়ানক কালো। না ছিল তার চেহারার কোন শ্রী, না তার চলাফেরায় কোন ছন্দ। কিন্তু যেমন ছিল সবল, তেমনি অবিচল। চেঁচামেচি করাই তার চিরকালের স্বভাব, কাজ করতে হলে আপত্তি, অভিযোগ আর গোরগোলের তার সীমা নেই। অবশ্য তার কারণ ছিল না যে তা' নয়। যে লেথিয়েরি এবং লেকশেং দু'জনের সমস্ত খাটুনি একাই তাকে খাটতে হতো। এবং সে বড় কম খাটুনি নয়। সে ছিল এক মালবাহী ষ্টীমবোট্‌।

ফি সপ্তাহে একদিন ক'রে সূর্যাস্তের পর, যখন আলো-আঁধারের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের তরঙ্গমালার বুকে, তখন সেণ্ট্‌ স্যাম্পসনের একটা ছোট বন্দরে, একটা আব্‌ছায়া বস্তু বেশ হইচই করে, হুইসিল্‌ দিতে দিতে এবং ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে তুমি দেখতে পাবে তিনিই হচ্ছেন ডুর্‌াঁদ।

তখনকার দিনে বাষ্পীয়পোত সবেমাত্র আবিষ্কার হয়েছে। তখন অনেকেই মনে করত যে ওগুলি শয়তানের বাহন। অমন ধোঁয়াটে নিঃশ্বাসের বহর এবং চড়া-গলার আওয়াজ দেখে-শুনে কুসংস্কারগ্রস্তদের মনে ওরকম ধারণা না হবেই বা কেন?

ইংলিশ চ্যানেলের ঐ দ্বীপগুলির অঞ্চলে ডুর্‌াঁদের আগে আর কোনো ষ্টীমবোট্‌ তখন দেখা যায় নি। প্রত্যেকেই তখন ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল যে, ঐ ষ্টীমার থেকে ভাল কিছুই হবে না। যে লেথিয়েরি সে সব কথায় কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু তারাই যখন আবার দেখলে যে ঐ শয়তানের বাহন নিয়মিতভাবে প্রতি মঙ্গলবার ফ্রান্সের সেণ্ট্‌ ম্যালো'র দিকে পাড়ি দিচ্ছে, এবং প্রতি শুক্রবার ফিরে আসছে প্রতিকূল বাতাসের তোয়াক্কা না করেই, তখন তারা রীতিমত অবাক হয়ে গেল। কেবল আসা-যাওয়াই নয়, নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে ফসল ও শিল্পদ্রব্য এবং নিয়ে আসছে গরু ভেড়া ছাগল, দেশী নৌকার চেয়ে ঢের বেশী আরামে ও অল্প সময়ে, তখন ক্রমশই তারা ঐ শয়তানী নৌকার ভক্ত হয়ে উঠল।

তখনকার দিনের আর সব কার্গোবোটের চেয়ে ডুর্‌াঁদ ছিল আকারে বড়। এঞ্জিন ছাড়া তাতে পাল খাটানোর আলাদা ব্যবস্থাও ছিল। এবং এই ডুর্‌াঁদ থেকে বাণিজ্য-ব্যাপারে ক্রমশঃ সেণ্ট্‌ স্যাম্পসনের লোকদের সম্পদ সমৃদ্ধি বেড়ে চলতে লাগল এবং লেথিয়েরিও সেখানকার একজন গণ্যমান্য লোক

হয়ে উঠলেন। এককালে অসংখ্যের জীবনরক্ষার জন্য সবার কাছে তাঁর এমনিতেই শ্রদ্ধার আসন পাতা ছিল, এখন স্বদেশের উন্নতিসাধনের হেতু হয়েছেন বলে সেণ্ট্ স্যাম্পসনের লোকেরা তাঁকে দেবতার চক্ষে দেখতে লাগল।

তিন

ফরাসী বিপ্লবের দুর্যোগের মধ্যে এবার আমাদের গল্পের যবনিকা উত্তোলিত হবে।

প্যারিসের একটি ছোট্ট ঘর। ঘরটি অত্যন্ত দরিদ্রের। সেই ঘরে বাস করে একটি লোক এবং তার স্ত্রী আর তাদের একটি ছোট ছেলে। লোকটির নাম র‍্যাতান।

লোকটি ছিল চোর তার স্ত্রী তাকে চুরির কাজে সাহায্য করত। কিন্তু যখনই অবকাশ পেত মেয়েটি ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বসত, তাকে লিখতে পড়তে শেখাত। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ছিল লেখাপড়া জানা—যদিও তারা পাপের পথে নেমে এসেছিল। অবশেষে একদিন তাদের দীর্ঘকালের কারাদণ্ড হয়ে গেল। ছেলেটি তখন হয়ে পড়ল একা এবং এই পৃথিবীতে সে নিজে ছাড়া তাকে দেখাশোনার আর কেউই রইল না।

কোন এক সমুদ্রযাত্রায় একজন দুঃসাহসিক লোকের সঙ্গে লেথিয়েরির দেখা হয়ে যায়। সেই সময় লোকটি লেথিয়েরিকে এক দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। লোকটি বুদ্ধিমান, কাজের এবং চটপটে। লোকটিকে বেশ পছন্দ হয়ে যায়। এই লোকটিই হচ্ছে আমাদের সেই র‍্যাতান।

র‍্যাতান ক্রমশঃ লেথিয়েরির অংশীদার হয়ে পড়ে। দু'জনেরই আকার-প্রকার ছিল প্রায় এক রকমের—শক্ত ঘাড়, চওড়া কাঁধ এবং প্রশস্ত বুক, যদিও র‍্যাতান ছিল লম্বায় একটু বড়ই। কিন্তু তাদের মুখের দিকে তাকালেই পার্থক্য ধরা পড়ত।

র‍্যাতানের ছিল প্রকাণ্ড নাক, চোখের পাশটা কোঁচকান, এবং কুলোর মতো কানে চুলের প্রাদুর্ভাব। লেথিয়েরির বর্ণনা তো আমরা আগেই দিয়েছি। লেথিয়েরি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু র‍্যাতান তার একেবারেই উল্টো—যাকে বলে দিলখোলা গোছের লোক। আমোদ করতে তার জুড়ি নেই। কত জায়গায় সে গেছে, কত দেশবিদেশে ঘুরেছে, কত বিপদের মুখে পড়েছে

এবং কত দুঃসাহসের কাজ করেছে,—সব সময়ে এই সব গল্পই ছিল তার মুখে। কিন্তু কতগুলি জেলের ভেতরের রহস্য তার জানা আছে, ঘুণাক্ষরেও তার আভাস সে কারুকে দেয় না। সামান্য একটু ব্যাপারে রেগে গিয়ে ডুয়েল লড়তেও সে কম মজবুত নয়। এরকম অনেক লড়াই সে এ পর্যন্ত বাধিয়েছে বন্দুক ছুঁড়তে ও ঘুসি চালাতে সে সমান ওস্তাদ—যে লেথিয়েরির মতনই। অবশেষে অকস্মাৎ দেখা গেল, লেথিয়েরি চল্লিশ বছরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে একলক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়েছেন, র‍্যাতান একদিন সুযোগ বুঝে তার অর্ধেক মেরে দিয়ে কোথায় চম্পট দিয়েছে। মানে, যা সে হাতের কাছে পেয়েছিল, নিয়ে পালাতে একেবারেই দ্বিধাবোধ করেনি।

এই সময়েই লেথিয়েরির মাথায় খেয়াল হলো ষ্টীম্ বোট চালাবার যে টাকা তখনও তাঁর বেঁচেছিল, তাই দিয়ে এবং আর যা দরকার, ধার করে ষ্টীমার সার্ভিস খুললেন। র‍্যাতানের অন্তর্ধানের ছ'মাস পরে, সেন্ট স্যাম্পসনের বিস্মিতনেত্রে একদিন দুরাঁদের আবির্ভাব দেখতে পেল। দেখতে পেল, দু'ধারের জলস্রোত ঠেলে, ঢেউ ছড়াতে ছড়াতে আর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যে লেথিয়েরির মানস-কন্যা বাহির হলো তার সর্বপ্রথম সমুদ্রযাত্রায়।

এর পরের ইতিহাস কিছু কিছু আমরা এই পরিচ্ছেদে আগেই জেনেছি। লেথিয়েরি ঘাটের কোঠায় পা দেবার মুখেই দুরাঁদের জন্যে তাঁকে যা ধার করতে হয়েছিল সে সব দেনা শোধ হয়ে গেল। এখন থেকে হলো তাঁর লাভের অঙ্ক সুরু এবং এখন থেকে, তাঁর সাধের মেয়ে দেরুশেতের বিয়ের কত চমৎকার চমৎকার সব যৌতুক তিনি উপহার দেবেন কেবল তারই স্বপ্ন তিনি দেখতে লাগলেন।

এখন থেকে যে লেথিয়েরি নিজে জাহাজ চালানো ছেড়ে দিলেন। জাহাজের সমস্ত ভার তিনি তুলে দিলেন সিউওর ক্লুব্যাঁ বলে একটি লোকের উপর। এই লোকটির মানুষ চেনবার অভিজ্ঞতা ছিল দারুণ। র‍্যাতান সম্বন্ধে সে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল যে লেথিয়েরিকে। এই কারণে লেথিয়েরির অগাধ বিশ্বাস এখন গিয়ে পড়ল ক্লুব্যাঁর উপর।

ষ্টীমার চালানোর ব্যাপারে ক্লুব্যাঁ খুব সুদক্ষ নাবিক। যা কিছু প্রয়োজনীয়, সমস্তই তার নখদর্পণে। যেমন সাহসী, তেমনি তার বিবেচনা শক্তি। আকারে সে ছিল বেঁটে এবং গায়ের রঙ তার হলদে মোমের মতো। সমুদ্রে ঘুরে ঘুরেও সে রঙ্ কোনদিন বাদামী হোলো না। দেহে তার অসুরের মত ক্ষমতা এবং খুব ভাল সাঁতারু বলেও তার সুখ্যাতি ছিল যথেষ্ট।

তার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার দেখলে কোনদিন সে-লোকের মুখ সে ভুলত না। তার চোখের দৃষ্টি দেখলে তোমার মনে হবে, যেন তোমাকে গিলে ফেলতে চাইছে। কথাবার্তা সে বলত খুব কম এবং অতি সংক্ষেপে, হাত পা না নেড়েই। তার ব্যবহার ছিল অতিশয় ভদ্র—এবং এত সরল যে, কারো কারো মনে হতো এতখানি ভালমানুষ আজকের দিনে পৃথিবীতে হয় না।

সত্যই, তার বিবেক-জ্ঞানটা একটু টন্‌টনেই ছিল। একটা আলপিন কুড়িয়ে পেলেও আত্মসাৎ করতে তার অনিচ্ছা হতো, তার মালিক খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার যেন স্বস্তি ছিল না। একবার সমুদ্রযাত্রার সময়ে, একটি ফরাসী বন্দরে পৌছেই এক হোটেলে গিয়ে সে উপস্থিত হয়। তার মালিককে গিয়ে বলে, "ওহে, তিন বছর আগে এধার দিয়ে যেতে যেতে তোমার হোটেলে যখন আমি খেয়েছিলাম, তখন তুমি দু'আনা পয়সা কম নিয়েছিলে আমার কাছে। তোমার হিসাবে ভুল হয়েছিল। যাক্, এখন এই নাও বাপু, তোমার সেই পয়সা!"

হোটেলের মালিক ক্লুব্যাঁকে চিনতেও পারে না, কিন্তু ক্লুব্যাঁ তাকে ঠিক চিনেছে। মালিক কিছুতেই সে পয়সা নেবে না, কিন্তু ক্লুব্যাঁও নাছোড়বান্দা। পয়সা না দিয়ে সেও নড়বে না সেখান থেকে।

কাজেই এমন লোকের হাতে যে লেথিয়েরি সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর স্টীমার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

চার

যে লেথিয়েরির লে-ব্রাভের বাড়িতে ছিল কেবল এই ক'জন লোক। কর্তা এবং তার ভাইঝি, দু'জন পরিচারিকা, ডাউস আর গ্রেস—দেরুশেতের সব কাজ, সমস্ত সেবা তারাই করত। দেরুশেতের একটা পিয়ানো ছিল, সেটা বাজানোই ছিল কেবল তার কাজ। পিয়ানোটিকে সে ভালবাসত। তাই বাজিয়ে সে গান গাইত। স্কচ্ সুরে সে গাইত, 'বনি-ডাণ্ডি' গানটি ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়।

বাড়ির মধ্যে দেরুশেতের ঘরটিই ছিল সব চাইতে চমৎকার। দুটো জানালা, মেহগনি কাঠের আসবাব, ফুলের মতন নরম বিছানা, জানালায় জানালায় সবুজ আর সাদা পর্দা টাঙানো। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই

সামনে চোখে পড়ে, খেলার বাগান এবং অনতিদূরে সেই পাহাড় যে পাহাড় তাদের বু-দে-লা-রোকে অন্তরাল করে রেখেছে সেণ্ট্ স্যাম্পসন নগরের অনু-সন্ধিৎসু দৃষ্টির লোলুপতা থেকে।

দেরুশেতের বাগানটি ছিল ভারি সুন্দর, সেই বাগানে সে ঘুরে বেড়াত ফুলপরীর মতো। নিচের তলায় খুব বড় একটা বসবার ঘর ছিল, সেই ঘরের পাশে একটা ছোট ঘর, মে লেথিয়েরির শয়নকক্ষ। এই ঘর দিয়ে দেখা যেত সেই ছোট বন্দরটি; চোখের সামনে উন্মুক্ত হতো সমুদ্রের অগাধ বিস্তার—মে লেথিয়েরি এখান থেকেই লক্ষ্য করতেন দুরাঁদের গতিবিধি। এই ঘরে ছিল একটা টেবিল, একটা চেয়ার, ঘরের দেয়ালে টাঙানো চ্যানেলের দ্বীপগুলির এক প্রকাণ্ড ম্যাপ। এবং ছিল মে লেথিয়েরির ধূমপানের পাইপ এবং একটি রুমাল, সেই রুমালে আঁকা সব দেশের জাতীয় পতাকা, ইউনিয়ান জ্যাক্ সবার মাঝখানটিতে। প্রতি শুক্রবার পাইপ-মুখে মে লেথিয়েরি তাঁর ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন, সেটা যে কিসের নির্দেশ সকলেই বেশ বুঝতে পারত। তারা বলত, "হয়েছে! দুরাঁদ আসছে, বুড়ো দেখতে পেয়েছে দূর থেকে!" এবং সত্য সত্যই হাতে-হাতে তাই ঘটত।

এই সময় থেকেই দেরুশেতের বিয়ের অনেক সম্বন্ধ আসতে সুরু হয়েছিল। যেমন সুন্দরী মেয়ে, তেমনি অগাধ সম্পত্তির মালিক—সুতরাং তার পাত্র হবার জন্য যুবকদের উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল মেয়ে এবং মেয়ের কাকাকে নিয়েই। তাদের মন পাওয়াই ভার। বিশেষ করে কাকার। যদিও তিনি বলে রেখেছিলেন—"হ্যাঁ, যাকে পছন্দ তোমার বিয়ে করতে পারো, আমার অমত নেই, কেবল এক পাদ্রী ছাড়া।" পাদ্রীদের উপর উনি ভারী চটা ছিলেন অন্তরে। তাঁর মনের বাসনা ছিল তিনি নিজেই একদিন মেয়ের পাত্র দেখতে বেরুবেন, সেই সময় দেখবেন সেই পাত্র যেন সুদক্ষ নাবিক হয়। কেন না তাঁর দুরাঁদের জন্য একজন ক্যাপ্টেনও তো চাই। ক্ল্যুব্যাঁ ক্রমশই বুড়ো হয়ে পড়ছে, পছন্দসই আরেকজনের তো দরকার তার পরে। তাঁর মনের মত সুন্দর যুবক কোন এক নাবিকের সঙ্গে দেরুশেতের বিবাহ যদি তিনি দেখে যেতে পারেন, তা'হলেই তিনি সুখে চোখ বুজতে পারবেন। আর দেরুশেৎ? সে হয়তো অন্য রকম স্বপ্ন দেখত!

পাঁচ

দেরুশেৎ তুষারের ওপর সেই যে লিখেছিল, তারপরে আরো চার বছর কেটে গেছে। তার বয়স এখন কুড়ি, এবং গিলিয়াটের ত্রিশ। এই চার বছর গিলিয়াট দেরুশেৎকে একটি কথাও বলেনি, যদিও এর প্রত্যেকটি দিন সে তাব বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে। বাগানের পাঁচিল খুব উঁচু ছিল না, অনায়াসেই সে ডিঙিয়ে যেতে পারত কিন্তু এরকম কল্পনাও কোনদিন মনে জাগেনি তার। সে কেবল আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, দেরুশেতের কণ্ঠস্বর যদি তার কানে যেত, অমনি যেন সমস্ত মন, সমস্ত শরীর তার, কেমন একটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

একদিন সে কা'কে যেন বলতে শুনল, 'দেরুশেৎ ভারি শাঁখালু ভালবাসে।' সেই দিনই সে বাড়ি গিয়ে নিজের বাগানে শাঁখালুর চাষ সুরু করল। যদিও সেই শাঁখালু দেরুশেৎকে উপহার দেবার সাহস কোনদিন হবে এমন ভরসা তার ছিল না। আর একদিন সে শুনতে পেলে স্বয়ং দেরুশেতের কণ্ঠ। কী সুন্দর স্বর্গীয় সেই কণ্ঠ! কী মিষ্টি তার আওয়াজ! দেরুশেৎ ঝিকে ডেকে বলছে, "গ্রেস্, ঝাঁটাগাছটা আমায় বাড়িয়ে দেবে?" অমূল্য হীরা-জহরতের মতো সেই কথাগুলি সংগ্রহ করে তার মনের মধ্যে সে সঞ্চয় করে রাখল। ক্রমশঃ তার সাহস বাড়তে থাকে। একদিন দেরুশেৎ পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছিল—'বনি-ডাণ্ডি'। গিলিয়াট উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল—আগাগোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল চিত্রার্পিতের মতো। এর পর গিলিয়াট একটা ব্যাগ্‌পাইপ কিনে বসল এবং 'বনি-ডাণ্ডি' গানটা বাজানোর অভ্যাস সুরু করল সেই যন্ত্রে। এক একদিন গভীর রাত্রে দেরুশেৎ শুনতে পেত তাব প্রিয় সেই গান, ভেসে আসছে সুদূর থেকে তার কানের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে ব'য়ে আনছে বিষণ্ণ একটা সুরের আমেজ,—সে অবাক হয়ে ভাবতে থাকত। মে লেথিয়েরিও একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে, গভীর রাত্রে শুনতে পেলেন সেই ব্যাগ্‌পাইপ, ব্যাপারটার কারণও তিনি খোঁজ করলেন। কিন্তু এই ধরনের আবেদন-নিবেদনে তিনি একেবারেই উৎসাহ বোধ করলেন না। তিনি আপন মনেই বল্লেন, "আমি নিজেই ওর ভালো বর খুঁজে বার করতে পারব। এ রকম বোকাদের বরদাস্ত করা আমার পোষাবে না।"

ছয়

যদিও পাত্রীদের সম্বন্ধে যে লেথিয়েরির তেমন উৎসাহ ছিল না, তবু বছরের মধ্যে বার-চারেক তিনি দেরুশেৎকে গির্জায় পাঠাতেন। প্রধান প্রধান উৎসব-গুলিতেই কেবল। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। সেন্ট্ স্যাম্পসন গির্জার যিনি রেক্‌টর ছিলেন তিনি পদোন্নতি লাভ করে সেন্ট্‌প্যারী পোর্টের বড় শহরে চলে গেলেন। তাঁর স্থানে যে নতুন রেক্‌টরটি এলেন তিনি বয়সে তরুণ। নাম এবিনেজার কড্রে। লোকটি খুবই পণ্ডিত, কিন্তু গরীব। তবে তার এক কাকা আছেন খুবই বড়লোক। যিনি হয়ত মৃত্যুকালে তাঁকে উইল করে সব দিয়ে যেতে পারেন। কাশমীয়ার নামক ডাকের জাহাজে তিনি আসছিলেন, তাঁর পৌছনোর আগে ভয়ানক ঝড় আর কুয়াশা গেছে, এই কারণে তাঁর সম্বন্ধে সবার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কিন্তু নিরাপদে তিনি পৌছলেন। সূর্যোদয়ের ঠিক একটুখানি আগেই।

সেই রাত্রেই, বাতাসের বেগ যখন বেশ কমে এসেছে, গিলিয়াট বেরুল মাছ ধরতে। কিন্তু বেশীদূর গেল না, ভোরের মুখেই ফিরে এলো। তখন সূর্য ওঠে ওঠে, জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। বু-দে-লা-রো যেখানে মোহনার মুখে এসে মিলেছে, সেখানে অদ্ভুত রকমের একটা পাথরের ঢিবি। ভাঁটার সময়ে সোজা এখান পর্যন্ত পৌছানো কিছু অসুবিধা ছিল না, কিন্তু যখন আস্তে আস্তে জোয়ারের জল বাড়ত তখন এই ঢিবির অংশটি অন্যান্য অংশের সঙ্গে আলাদা হয়ে যেত এবং ক্রমশঃ গভীর জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যেত।

ঢিবিটার সম্বন্ধে বিস্ময়ের এই যে : এটা ছিল ঠিক প্রাকৃতিক ইজিচেয়ারের মত। বেশ আরামের আসন, সুন্দরভাবে পালিশ করা—হাত এবং পা রাখারও জায়গা আছে। দেখলেই বসতে ইচ্ছে হবে সবার—সেখানে বসে বসে চারদিকে তাকালে চোখ আর ফেরান যায় না, সে দৃশ্য কী চমৎকার! সম্মুখে সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তার, মাথার ওপরে সুনীল আকাশ, আর দূরে দূরে ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ। দেখতে দেখতে কখন তুমি তন্ময় হয়ে পড়বে, তোমার চারি-পাশের জল যে ক্রমশঃ বেড়ে উঠে তোমাকে গ্রাস করতে উদ্যত, সে খেয়ালই হবে না তোমার। গিলিয়াট অনেকবার এই চেয়ারে বসেছে, অবশ্য জোয়ারের মুখে কোনদিনই নয়।

আজ সকালে গিলিয়াট যখন এই জায়গাটার পাশ দিয়ে ফিরছে, তখন সে একজন লোককে ঐ চেয়ারে বসে থাকতে দেখল। ঢিবিটার কাছাকাছি তার

নৌকা ভিড়িয়ে লক্ষ্য করল লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে। চিবিট চারিধারে তখন জল থৈথৈ করছে এবং ক্রমশঃই বাড়ছে তার উচ্ছ্বাস। লোকটির গায়ে কাল রঙের পোশাক। বয়স তার বেশী নয়, কিন্তু একেবারে অচেনা মুখ। গিলিয়াট আগে কখনো দেখেনি একে। মনে মনে সে ভাবলে, বোধ হয় কোন পাদ্রী-টাদ্রী হবে।

"এখানে কি করছ তুমি?" গিলিয়াট জিজ্ঞাসা করল তাকে।

গিলিয়াটের চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল।

"চারিধার দেখছি"—চোখ মুছতে মুছতে সে বলে চল্লো, "সবে মাত্র এই দেশে এসে পৌচেছি কিনা! কাল সমস্তদিন জাহাজের ওপর ছিলাম উত্তাল সমুদ্রে—চোখ বুজতে পারিনি। খুব ক্লান্ত বোধ করে এখানে এসে বসেছিলাম। চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি হয়ত।"

"আর দশ মিনিট হলেই ডুবে যেতে যে!" গিলিয়াট বললে।

এবিনেজার কড্রে তখন চারিপাশে তাকাল। সত্যই তো! নিজের বিপন্ন অবস্থা অতি সহজেই সে বুঝতে পারল। গিলিয়াট হাত বাড়িয়ে দিতে, সেই হাত ধরে আস্তে আস্তে সে নৌকার ওপর লাফিয়ে পড়ল। এই নতুন পাদ্রীটির চেহারা ছিল খুব সুন্দর, বড় বড় টানা চোখ, মাথাভরা ঝাঁকড়া ঘন চুল। তার দেহ ছিল দীর্ঘ এবং সুঠাম; হাসি ছিল মনভোলানো আর দাঁতগুলি ছিল মুক্তার মত ঝকঝকে।

গিলিয়াট নৌকা নিয়ে এসে তীরে বাঁধল। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেলে, একখানি ধবধবে তুষারের মত সাদা হাত তার দিকেই প্রসারিত—সেই হাতের মুঠায় একটি স্বর্ণমুদ্রা। সে আস্তে আস্তে হাতখানা সরিয়ে নিল। এক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধতা—তারপর তরুণ যুবকটি বললে, "তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।"

"সম্ভবতঃ।" গিলিয়াট উত্তর দিল।

যুবকটি বল্লে, "আমার জীবনের জন্য তোমার কাছে আমি ঋণী।"

"তা'তে কি হয়েছে?" গিলিয়াট বল্লে।

"তুমি কি এই জায়গার লোক?" পাদ্রী প্রশ্ন করল।

"না।" গিলিয়াট উত্তর দেয়।

"তবে কোথাকার?"

আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে গিলিয়াট বলে—"আমি? আমি ঐ ওখানকার।"

যুবকটি তা'কে নমস্কার ক'রে চলতে সুরু করে। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে থামে, পকেটে হাত ঢোকায়, একখানা বই বার করে এবং ফিরে এসে বইখানা গিলিয়াটের হাতে দেয়। "এই বইখানা তুমি নাও। নিলে আমি সুখী হব।"

বইখানা বাইবেল, গিলিয়াট হাত পেতে নেয়।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই গিলিয়াট সমস্ত ভুলে যায়, ভুলে যায় সেই যুবকের কাণ্ড এবং তার উপহারের কথা—তার চিন্তাধারা ঘুরে বেড়ায় সেই পথে, যেখানে চিরদিন ঘুরছে।

দেরুশেৎ আর দেরুশেৎ!

গিলিয়াট আনমনা হয়ে পথ চলে।

হঠাৎ একজনের কথায় তার চমক ভেঙে যায়। সে আবার তার নিজের মধ্যে ফিরে আসে।

লোকটা তা'কে বলে—"খবর আছে যে, গিলিয়াট! খুব জোর খবর!"

"কি শুনি?"

"লে ব্রেভের খবর!"

"কুমারী দেরুশেতের বিয়ে নাকি?" গিলিয়াট মনে মনে কাঁপতে থাকে।

"না, ঠিক তার উল্টো।"

গিলিয়াটের ধড়ে প্রাণ আসে। "তা'হলে কি তবে?"

"যদি ওধারে যাও, তুমি নিজেই জানতে পারবে।"

সাত

এখানে, আমাদের গল্পের ধারা থেকে, একটু পিছিয়ে আসতে হবে।

একদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায়, দুরাঁদ যথারীতি সেণ্ট্ ম্যালোয় এসে পৌচেছে। সিওর ক্লুব্যাঁ তীরে নেমেছেন।

জাহাজ থেকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন দু'জন লোক, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে, খুব উৎসাহের সঙ্গে পা-হাত নেড়ে কথাবার্তা কইছে। একজনকে তিনি চিনতে পারেন সহজেই। তার নাম জুয়েলা, এক স্প্যানিস জাহাজের কাপ্তেন, খুব শীঘ্রই দক্ষিণ আমেরিকায় ওদের পাড়ি দেবার কথা। অপর লোকটিকেও তাঁর চেনা-চেনা মনে হলো। তার লম্বা কোট, চওড়া টুপি এবং চোখের দৃষ্টি বিনয়ে সর্বদাই যেন মাটির দিকে নিবদ্ধ।

এরপর ক্লুব্যাঁ এক বন্দুকের দোকানে যান। জিজ্ঞাসা করেন, "রিভলভার কাকে বলে, তুমি জানো?"

"হ্যাঁ।" দোকানী জবাব দেয়, "একজাতীয় পিস্তল, বলতে না বলতে যার মুখ দিয়ে গুলি বেরয়।"

"পর পর পাচ-ছ'টি গুলি!" ক্লুব্যাঁ যোগ করেন।

"হ্যাঁ, ভারী চমৎকার জিনিস।" উচ্চ-প্রশংসায় যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দোকানী।

"আমার একটা দরকার।"

"এখন তো আমার দোকানে নেই!—এই নতুন বাজারে বেরিয়েছে জিনিসটা। তবে—এর পরে যখন তুমি আসবে"—

"বেশ, তাই।" ক্লুব্যাঁ বলে।

তার পরের মঙ্গলবারে, দুর‍াঁদ আবার আসে সেণ্ট্ম্যালোয়। ক্লুব্যাঁ নেমে নিজেই সরাইখানায় যান। সেই স্প্যানিশ জাহাজটা তখনো নোঙর করা রয়েছে। "কবে ছাড়বে জাহাজ?" ক্লুব্যাঁ জিজ্ঞাসা করেন।

"বেস্পতিবার—কাল বাদে পরশু দিন।" জবাব আসে।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ক্লুব্যাঁ বেরিয়ে পড়েন শহরের দিকে এবং ফেরেন অনেক রাত করে।

পরদিন সন্ধ্যার মুখে দু'জন লোক সেণ্ট্ম্যালোর একটা অপরিচ্ছন্ন পল্লীর দিকে যাচ্ছিল, খুব আস্তে আস্তে হেঁটে। তাদের মধ্যে একজন আমাদের ক্লুব্যাঁ, আর একজন সেই বন্দুকের কারবারী।

শহরের সেই ধারটায় যত বদমাইসের আড্ডা। যত ফেরারী লোক আর চোর ডাকাত গাঁটকাটাদের, অপরিচ্ছন্ন পল্লীর দারিদ্র্যের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার সুবিধা ছিল সেখানে। গলি-রাস্তাটার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে, এক দরজার কাছে দাঁড়াল তারা।

জানালায় টোকা মারতেই একটা খোঁড়া মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। তারা ভিতরে ঢুকল। মেয়েটি একটি বাতি জ্বালিয়ে রেখে, একটু হেসে, পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেল। মেয়েটি যেতেই, একটা লোক সেই পথ দিয়েই সেখানে এসে উপস্থিত হলো। অদ্ভুত রকমের তার পোশাক।

লোকটি একজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—"তুমিই কি বন্দুকের দোকানী?"

"হ্যাঁ, তুমিই বুঝি প্যারিস থেকে এসেছ? কই দেখাও দেখি জিনিসটা।"

"এই যে"—জামার পকেট থেকে লোকটা একটা জিনিস বার করল। ঝকঝকে একটা রিভলভার।

দোকানী একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে, তার সঙ্গীর হাতে দিল জিনিসটা। "কত দাম এর?" দোকানীটি প্রশ্ন করে।

লোকটি জবাব দেয়: "আমেরিকা থেকে এটা আমি এনেছি। এরকম চমৎকার জিনিস আর হয় না!"

"দাম কত?" দোকানী আবার প্রশ্ন করে।

"ঠিক ইঞ্জিনের মত চলে এই পিস্তল!"

"কত দাম?"

"ছ'টা গুলি ছোড়া যায় ছ'টা মুখ দিয়ে।"

"বেশ, বেশ। দামটা কী?"

"ছ-নলা, ছ-পাউণ্ড এর দাম।"

"পাঁচ পাউণ্ডে দেবে?"

"না, না। এক একটা গুলির জন্য এক এক পাউণ্ড। তা' হলেই ন্যায্য হয়।"

এর পর লোকটা আবার পিস্তলটার সৌন্দর্য আর চমৎকারিত্বের নিখুঁত বর্ণনা দিতে শুরু করে। দোকানীটা যতই দর কমানোর চেষ্টা করে, ততোই তার বর্ণনার আধিক্য বেড়ে যায়। ভদ্রলোকের এককথার মতো, এক দামেই, আঠার মতো সে লেগে থাকে। ছ-পাউণ্ডের কমে রিভলভারটা ছাড়তে কিছুতেই সে রাজী নয়।

ক্লুব্যা তখন দোকানীকে প্রশ্ন করেন—"সত্যিই কি জিনিসটা ভালো?"

"তা'তে আর ভুল নেই।" দোকানী উত্তর দেয়।

"তা'হলে আমি ছ-পাউণ্ডেই রাজী।"

রিভলভারটা কিনে ক্লুব্যা, নিজের সরাইখানায় ফিরে আসেন। জামার তলায় লুকিয়ে নিয়ে আসেন অবিশ্যি।

আট

পরদিন বৃহস্পতিবার, সেণ্ট্‌ম্যালো থেকে খুব দূরে নয়, এক জায়গায় এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটল।

অজগরের ফণার মত, সমুদ্র তীরের একটা পাহাড়ে জায়গা, হঠাৎ উত্তাল য়ে, সমুদ্রের বুকের ওপর গিয়ে যেন ঝুঁকে পড়েছিল। প্রায় ষাট ফিট্‌ খাড়া উঁচু

সমুদ্র থেকে, তার তলায় অনবরত ঢেউ এসে আছাড় খাচ্ছে। ফণার ওপরটা সমতল এবং ওতে ওঠার জন্ত পাথরের টুকরো দিয়ে একটা প্রাকৃতিক সিঁড়ির মতো তৈরী করা আছে, শক্তিমান মানুষের পক্ষে যার ব্যবহার বিশেষ শক্ত নয়।

সেদিন বিকালে, সূর্য ডোবে, তখন সেই পাহাড়ে ফণার ওপর দাঁড়িয়ে, টেলিস্কোপ্ চোখে দিয়ে একজন লোক দূরে সমুদ্রের দিকে কি যেন লক্ষ্য করছিল। লোকটা কোসট্‌গার্ড, সমুদ্র তীরের পাহাড় দেখাই তার কাজ।

তিন মাস্তুল তোলা একটা জাহাজের চালচলন ভারী অদ্ভুত ঠেকছিল তার কাছে। সেন্ট্‌ম্যালো থেকে অল্প আগেই জাহাজটা ছেড়েছে কিন্তু, হাওয়া যদিও প্রতিকূল নয়, তবু তার গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে আসছিল। মাঝ-সমুদ্রে জাহাজটা হঠাৎ থেমে গেল। জাহাজের সমস্যা নিয়েই কোসট্‌গার্ড এমনি তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, তার ঠিক পিছনেই যে আর একজন লোক দাঁড়িয়েছে তার খেয়াল ছিল না।

এ লোকটা হচ্ছে সেই লোক, কয়েকদিন আগে সিণ্ডর ব্রুব্যা যাকে কথা বলতে দেখেছিল ক্যাপ্তেন জুয়েলার সঙ্গে।

মনে হলো কালো মাছির মত কী একটা জিনিস যেন জাহাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিল। সেটা একটা বোট, টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে কোসট্‌গার্ড বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলে এবং একটু পরেই প্রতীয়মান হলো নৌকোটা ঠিক তার দিকেই আসছে। আগ্রহ এবং বিস্ময়ের আতিশয্যে কোসট্‌গার্ড একেবারে ফণার ধার ঘেঁষে দাড়াল।

পিছনের লোকটিও এবার নিঃশব্দে এগুতে থাকে। এক পা এগোয়, একটু থামে, আর এক পা এগোয়, একটু ইতস্ততঃ করে,—আর এক পা এগোয়, এখন সে কোসট্‌গার্ডের একেবারেই পিছনে, তখনো সমস্ত বিশ্বসংসার ভুলে সে একমাত্র বোটই দেখছে।

পিছনের লোকটি হঠাৎ তার দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে—তারপর বিদ্যুৎবেগে ঘুষি মারে কোসট্‌গার্ডের দেহে। কোস্‌ট্‌গার্ড চীৎকার করার সময়ও পায় না। সেই এক ধাক্কাতেই একবারে তলায় সমুদ্রের গর্ভে। চকিতের জন্ম কেবল তার পা-দুটো দেখা যায়, তারপর উত্তাল ঢেউ তাও মুছে দেয়।

লোকটা ঝুঁকে একবার নিচের দিকে দেখে নেয়, তারপর মৃদু স্বরে গান সুরু করে—

"প্রিয় বন্ধু গেলেন মার,
গেলেন মারা শেষেই!"—

আরেকবার সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে। না, কিছুই দেখা যায় না। কোসট্‌গার্ডের চিহ্নমাত্রই নাই। আবার সে গান ধরে—

"এখন আমি বন্ধুহারা
এই ঘোর বিদেশেই!
প্রিয় বন্ধু গেলেন মারা"—

অকস্মাৎ তার গান থেমে যায়। পিছন থেকে কে যেন ডাক দেয় নরম গলায়: "শুভ সন্ধ্যা, র‍্যাতান! এইমাত্র একজনকে তুমি খতম করেছ!"

সে ফিরে দাঁড়ায়, তার পাঁচ-ছ'গজ দূরেই একটি বেঁটে মানুষ, তার হাতে রিভলভার।

"দেখতেই পাচ্ছ! শুভ সন্ধ্যা, সিওর ক্রুব্যাঁ!"

"চিনতে পেরেছ আমায়?" বেঁটে লোকটি জবাব দেয়।

"আমাকে যখন চিনতে পেরেছ, তখন তুমি ছাড়া আর কে হবে!" অপর লোকটি বলে।

এই সময় দূরে থেকে বোটের দাঁড় ফেলার ছপাছপ্ আওয়াজ আসতে থাকে।

"কি করতে পারি আমি তোমার জন্য।" র‍্যাতান জিজ্ঞাসা করে।

"বিশেষ কিছু না। দশ বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো। বেশ ভালোই চলছে তোমার, আমি বলতে পারি। তুমি আছ কেমন?"

"মন্দ কি!" এই বলে র‍্যাতান ক্রুব্যাঁর দিকে অকস্মাৎ এগোবার চেষ্টা করে।

ক্রুব্যাঁ রিভলভারটা তুলে ধরে—"যেখানে আছ বরং সেখানেই থাকো। এগুনো নিরাপদ হবে না তোমার পক্ষে।"

"তুমি চাও কী?"

"এই একটু কথাবার্তা কওয়া, তাছাড়া আর কী!" ক্রুব্যাঁ জবাব দেয়, "এইমাত্র একটা কোসট্‌গার্ডকে খুন করেছ তুমি!"

"একবার তো বলেছ একথা!"

"না, আগে বলেছি একটা লোক। এখন আমি বলছি ওর নম্বর ছ'শো তিনিশ। ওর বউ আছে, তাছাড়া পাঁচটি ছেলেমেয়ে।"

"প্রায়ই থাকে ওদের!" র‍্যাতান বলে।

সিওর ক্রুব্যাঁ বলেই চলে—"এই রিভলভারটার জন্য কতো পড়েছে আন্দাজ করতে পারো?"

"ভালো রিভলভারই বটে!"

"একশ চল্লিশ ফ্রাঁ এর দাম।"

"সেই খোঁড়া মেয়ের আড্ডা থেকে কিনেছ নিশ্চয়ই!" র‍্যাতান বলে।

"লোকটা চেঁচাবারও অবকাশ পেলে না—আহা!"

"পড়বার মুখে কেউ চেঁচাতে পারে না।" র‍্যাতান আবার এগোবার চেষ্টা করে।

"পিছিয়ে যাও বাপু! যেখানে ছিলে সেখানেই! দেখতে পাচ্ছ তো!" ক্লুব্যাঁ রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করে।

"ভাল আপদেই পড়লাম!" র‍্যাতান পিছিয়ে যায়।

"ব্যাপার তোমাকে খুলেই বলি।" এই বলে, গুরুগম্ভীর গলায় ক্লুব্যাঁ এবার আরম্ভ করে—"আমাদের দক্ষিণে প্রায় একশ' গজ দূরে আছে আরেকজন কোসট্‌গার্ড, তার নম্বর ছ'শো আঠারো; বেঁচেই আছে সে। আর আমাদের বা দিকে কাষ্টমস্ হাউস ষ্টেশন। অতএব বুঝতেই পারছ, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সশস্ত্র প্রহরীদের এখানে আনা যায়। আর এই খাড়াইয়ের তলায় রয়েছে এক মৃতদেহ"—

র‍্যাতান রিভলভারটার দিকে তাকায়।

"আর এটা হচ্ছে ছ-নলা। প্রথম গুলির আওয়াজেই সশস্ত্র প্রহরীরা এসে পড়বে। তারপর, আমি জানি, ঐ যে বোট তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আসছে, ঐ বোট তোমাকে কাপ্তেন জুয়েলার জাহাজে তুলে দেবে—সেই জাহাজে সটান তুমি আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছ। কেমন, সত্য কিনা?"

র‍্যাতানের চোখ এবার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়।

"এবং এও আমি জানি, তুমি কাপ্তেন জুয়েলাকে তোমার ভাড়ার অর্ধেক আগেই দিয়ে দিয়েছ। পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। তোমার ছদ্মবেশও বেশ নিখুঁত হয়েছে র‍্যাতান! ঐ অদ্ভুত পোশাক—তারপর, লম্বা লম্বা গোঁফ! তবে একজোড়া চশমা এই সঙ্গে হলেই আরো চমৎকার হতো!"

র‍্যাতান অধৈর্য হয়ে পড়ে। তার মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায়।

ক্লুব্যাঁ বলেই চলে—"তোমার ট্রাউজারের দু'টো পকেট, একটায় আছে তোমার ট্যাক্-ঘড়ি, ওটা তুমি রাখতে পারো।"

র‍্যাতান এতক্ষণে একটি মাত্র কথা বলে—"ধন্যবাদ!"

"অন্য পকেটে আছে ছোট্ট একটা লোহার বাক্স—নস্যির ডিবের মতো। ওটা বের করো। ছুঁড়ে দাও আমার দিকে।"

"ওতো চোরাই মাল!"

"তা'হলে পুলিশ ডাকো তুমি।"

"আচ্ছা, একটা রফা করলে কি হয় না আমাদের মধ্যে? আমি অর্ধেক দিচ্ছি তোমায়।"

"র‍্যাতান!" এবার ক্লুব্যাঁ চেঁচিয়ে ওঠে "তুমি কি মনে করেছ আমায়? আমি একদম খাঁটি লোক।" (একটু থেমে তারপর) "সমস্তই দিতে হবে আমাকে।"

র‍্যাতান কোন উত্তর দেয় না।

"তুমি আমায় ভুল বুঝেছ দেখছি।" এবার ক্লুব্যাঁর চোখ চকচক ক'রে ওঠে, কণ্ঠ ইস্পাতের মত ধারালো হয়। "আমি জানি ঐ ছোট্ট বাক্সের মধ্যে পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁর ব্যাঙ্ক নোট আছে। দশ বছর আগে লেথিয়েরির পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ তুমি চুরি করেছিলে। এতদিনে সুদে-আসলে তা' আরো বেশী হবার কথা, কিন্তু যে লেথিয়েরির নামে ঐ পঁচাত্তর হাজারই আমি নেব এবং কাল যখন গোয়ার্ণসি পৌঁছব, টাকাটা গিয়ে দেব তাঁকে। ইতিমধ্যে তোমার মালপত্তর সবই তো জুয়েলার জাহাজে রয়েছে, এবং ভাড়াবাবদে পাঁচ হাজার আগেই দিয়ে রেখেছ, তোমার এখান থেকে পালানোর প্রয়োজনও কম নয়। তোমার বোটও এসে পড়ল বলে! তবে, তুমি যদি আমার কথা রাখো, তবেই বোটে চড়া হবে তোমার, নতুবা— বুঝতেই পারছ! যাক, আর কথায় কাজ নেই, আলাপ-সালাপ অনেক হলো! এখন বাক্সটা ছুঁড়ে দাও আমায়।"

র‍্যাতান পকেটে হাত পুরে দেয়, ছোট বাক্সটা বের ক'রে ছুঁড়ে দেয় ক্লুব্যাঁর দিকে। ওর পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে সেটা।

"আচ্ছা, এইবার পিঠ-ফিরিয়ে দাঁড়াও।"

আদেশ মান্য করে র‍্যাতান। ক্লুব্যাঁ বাক্সের ঢাকনা খুলে ব্যাঙ্ক নোটগুলো গুণে ত্যাখে। তারপর সে ছোট্ট একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে, তা'তে দশ পাউণ্ডের একটা নোট জড়ায়।

র‍্যাতান ফিরে দাঁড়ায়।

"এই নাও দিলাম তোমায়!" বলে নোট-মোড়া পাথরের টুকরোটা ছুঁড়ে দেয় র‍্যাতানের দিকে। র‍্যাতান পা দিয়ে সুট্ করে নোটখানাকে সমুদ্রগর্ভে পাঠিয়ে দেয়।

"যাক্", ক্লুব্যাঁ বলে, "বড়লোক হয়েছ তা'হলে! অনেকটা স্বস্তি পেলাম এতক্ষণে!"

নয়

দাঁড় ফেলার ঝপঝপ শব্দ ক্রমশঃ থেমে এল, নৌকা এসে ভিড়েছে তলায়।

"দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে! র‍্যাতান, তুমি যেতে পার এবার।" ক্লুব্যাঁ রহস্যের ছলেই যেন বলে।

র‍্যাতান প্রাকৃতিক সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। ক্লুব্যাঁ ওপর থেকে উঁকি মেরে লক্ষ্য করে।

কোস্ট্‌গার্ড যেখানে পড়েছিল, বোটটা সেইখানেই এসে ভিড়েছে।

"বেচারী ছ'শো উনিশ!" আপন মনেই বলে ক্লুব্যাঁ। "তুমি নিজেকে একাকী ভেবেছিলে। র‍্যাতান ভেবেছিল তোমরা দু'জন কেবল! কিন্তু আমি জানতাম যে তিনজন আছে এখানে।" ক্লুব্যাঁ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—"তাই আমারই জিত্‌ হলো!"

র‍্যাতান নৌকায় চড়ে, ক্লুব্যাঁর উদ্দেশে ঘুষি আস্ফালন করে—"সিঙর ক্লুব্যাঁ, আমি জানি তুমি সাধুপুরুষ! তবু আমি মে লেথিয়েরিকে যদি চিঠি লিখে জানাই, তুমি কিছু মনে করবে না আশা করি! এই বোটের একজন দাঁড়ি গোয়ার্ণসির লোক, আমেরিকার ক্ষেপ্‌ সেরেই সে দেশে ফিরবে। সেই আমার সাক্ষী, মে লেথিয়েরির পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁ আমি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি।"

ক্লুব্যাঁ কোন জবাব দেয় না। যতক্ষণ না নৌকাটা গিয়ে জাহাজে লাগে এবং জাহাজ ছেড়ে দেয়, ততক্ষণ নীরবে শান্ত হয়ে সে লক্ষ্য করে। তারপর, চিন্তান্বিত মুখে আস্তে আস্তে সে নামে, শহরের মধ্যে যায়, একটা অচেনা দোকান থেকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি কেনে—এবং নিজের জাহাজে ফেরে। পরদিন তার নিজের ফেরৎ প্যাড়ির সব প্রস্তুত কিনা পর্যবেক্ষণ করে রাত্রিবাসের জন্য নিজের সরাইখানায় সে ফেরে।

সরাইখানার এককোণে, এক বুড়ো কাপ্তেন তখন একসঙ্গে বীয়ার খাচ্ছিল এবং ধূমপান করছিল—ক্লুব্যাঁ তার কাছে গিয়ে বসল।

বুড়ো কাপ্তেন বল্লে, "জুয়েলা চলে গেছে!"

ক্লুব্যাঁ বল্ল—"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায়!"

"ওরা যাচ্ছে কোথায়?' ক্লুব্যাঁ জিজ্ঞাসা করে।

"জাহান্নমে।"

"তা'তো নিশ্চয়ই।" ক্লুব্যাঁ উত্তর দেয়।

"তবু একটা জায়গা তো আছে?"

"আমেরিকা।"

"তা'তো জানি! তবু পথে কোন্ বন্দরে ওরা ধরবে?"

"কোথাও না। সোজা যাচ্ছে আমেরিকায়।"

"তা'হলে কোনো খবর পাঠানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়? কি বলো?"

"আমাকে মাপ করতে হলো, সিওর ক্লুব্যাঁ! পথে যে জাহাজ ওর পাশ দিয়ে যাবে তাতেই ও খবর পাঠাতে পারে।"

"তা' পারে বটে।"

"তা'ছাড়াও, সমুদ্রের ডাক-বাক্স আছে।"

"সে আবার কি?" সিওর ক্লুব্যাঁ একটু আশ্চর্যই হয়।

"পথে যেতে ম্যাগেলান প্রণালী পড়বে, জানো তো? ডানদিকে পাহাড়, বাঁদিকে পাহাড়, পেঙ্গুইনের ছড়াছড়ি—সেই জায়গা! সেইখানেই পোষ্টাফিস।"

"পোষ্টাফিস আবার কি জিনিস, ক্যাপ্টেন্?"

"আহা, তা'ও জানো না? গেলেই দেখতে পাবে। একশ' ফিট উঁচু একটা থাম, তার সঙ্গে চেন দিয়ে এক মস্ত পিপে বাঁধা—ঢাকনা আছে, তবে তালা বন্ধ নয়। সেই পিপের গায়ে বড় বড় অক্ষরে, ইংরাজীতে লেখা 'POST OFFICE'! এই ইংরেজরা মনে করে তারাই যেন দুনিয়ার সব।"

বুড়ো কাপ্তেন অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারপর আবার তার বলা সুরু হয়: "অবশ্য কেবল ইংরেজদের জন্যই হয়নি ওটা। ওই বাক্সে যে-কেউ চিঠি ফেলতে পারে, ঠিক জায়গায় পৌছে যাবে সে-চিঠি!"

পোষ্টাফিস-মাহাত্ম্য শুনে ক্লুব্যাঁ একেবারে অবাক হয়ে যায়—"বল কি কাপ্তেন!"

"ঐরকমই। এখন এই জুয়েলার হতভাগা যদি তোমাকে কি আমাকেই কিছু লিখতে চায়, ওই পিপের মধ্যে তার চিঠি দিলেই হলো, ব্যস্! তারপর ঐ পথ দিয়ে প্রথম যে জাহাজ আসবে সেই ঐ চিঠি এনে হাজির করবে।"

"আশ্চর্য তো!" চিন্তিত মুখেই ক্লুব্যাঁ যোগ করে।

"কালই তোমরা নোঙর তুলছ নাকি?"

ক্লুব্যাঁ নিজের ভাবনায় এমন ডুবে থাকে যে শুনতেই পায় না, কাপ্তেন আবার প্রশ্ন করে "কালই ফিরছ তোমরা?"

"নিশ্চয়ই। শুক্রবার পৌছতেই হবে আমাদের।"

"তা' বটে। তবে আমি হলে কাল পাড়ি দিতুম না।" বুড়ো কাপ্তেন গম্ভীর মুখে বলে, চারিধারে ভারী দুর্লক্ষণ দেখছি। সামুদ্রিক পাখীরা লাইটহাউস বেড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, পোকারা বেরিয়ে আসছে গর্ত থেকে, পায়রারা তর্কাতর্কি জুড়েছে—তা' ছাড়া আজকের সূর্যাস্তটাও খুব সুবিধার হলো না। কাল কুয়াশা হবে নির্ঘাৎ। আর কুয়াশা হচ্ছে ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক। যেয়ো না।"

দশ

বুড়ো কাপ্তেনের সমুদ্রের আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। তার উপদেশ অবহেলার নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পরদিন, শুক্রবার সকালে, ন'টা বাজতেই. যথারীতি দুর্‌ঁাদ ছাড়ল গোয়ার্ণসির উদ্দেশে।

বুড়ো কাপ্তেন আবোল-তাবোল বকেছে বলেই মনে হলো ক্লুবঁ্যার। চমৎকার সকাল, ঝকঝক করছে সূর্য, চকচকে রোদ—কুয়াশার চিহ্নমাত্রও নেই।

বেশী মালপত্রও ছিল না এ-ক্ষেপে। অন্য অন্য বারের চেয়ে কমই বরং। নানা ব্যাপারে ব্যস্ততার জন্য ক্লুবঁ্যা এধারে মন দিতে পারেনি। গরু ভেড়ার সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না।

ছ'জন মোটে যাত্রী। একজন গোয়ার্ণসির লোক, দু'জন সাঁম্যালোর গরুভেড়া কেনা-বেচার ব্যাপারী, একজন টুরিস্ট, প্যারিস থেকে একজন ভদ্রলোক, আর একজন আমেরিকান,—বাইবেল বিতরণ করাই তাঁর কাজ।

জাহাজের নাবিক সাতজন। ইঞ্জিনীয়ার এক নিগ্রো। জাহাজের হাল যার হাতে তার নাম ট্যাংগ্রোইল, গোয়ার্ণসির লোক সে। নাবিক হিসাবে সে কিছু মন্দ নয়, তবে তার এক ভীষণ দুর্বলতা ছিল, মদ্যপান। সিওর ক্লুবঁ্যা এ সত্ত্বেও, ওকে ছাড়তে চায়নি এবং ট্যাংগ্রোইলের দুর্বলতা থেকে দুর্‌ঁাদের কোন বিপদও ঘটেনি এ পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার রাত্রে, ক্লুবঁ্যা জাহাজে এসে যখন সব দেখে-শুনে নিচ্ছে, ট্যাংগ্রোইল অকাতরে ঘুমুচ্ছে তখন। তীরের কোন সরাইখানার চেয়ে জাহাজই সে পছন্দ করত—জাহাজেই সে থাকত এবং ঘুমোতও জাহাজে।

গভীর রাত্রে একবার তার ঘুম ভাঙল এবং যেমন তার চিরদিনের অভ্যাস, ঘুম থেকে উঠেই জাহাজের এক গুপ্তস্থানে সে গেল। তার সামান্য কিছু মদ লুকানো থাকত সেইখানে। কাপ্তেন ক্লুব্যাঁ নিজে মদ্যপান করত না, এইজন্য এ বিষয়ে একটু কড়াই ছিল সে,—তবু তাঁকে লুকিয়ে, কোনপ্রকারে এক-আধচুমুক 'জিন্' কি 'রাম' খাবার সুযোগ নিত ট্যাংগ্রোইল।

আজ রাত্রে গুপ্তস্থানে গিয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল সে। আস্ত একবোতল ব্র্যাণ্ডি রয়েছে সেখানে। এ জিনিস এখানে এল কি করে? ও নিজে এনেছে বলে তো ওর মনে পড়ে না। তবে? যাক্, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার চেয়ে, ওর সদ্ব্যবহার করাই ওর যুক্তিযুক্ত মনে হলো। বোতলের এক ফোঁটাও সে অবশিষ্ট রাখল না।

এদিকে সিওর ক্লুব্যাঁ সেইরাত্রে সরাইখানায় সেই লোহার ছোট বাক্সের গায়ে, চিরস্থায়ী কালি দিয়ে লিখল নিজের নাম—এবং বাক্সটা শক্ত করে বাঁধল নিজে কোমরবন্দে। সেই ছোট বাক্সের মধ্যে ছিল র‍্যাতানের পরিত্যক্ত ব্যাঙ্ক নোটগুলো। এ ছাড়া সে আলাদা করে রাখল কুড়িটা সোনার মোহর, যদি হঠাৎ কোন প্রয়োজনে দরকার পড়ে যায়।

এগারো

ডুরাঁদ ছাড়ল। প্যাসেঞ্জাররা ঘুরে ঘুরে বোটের ইঞ্জিন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, ষ্টীমারের প্যাসেঞ্জাররা সাধারণতঃ যা করে থাকে। টুরিসট্ এবং প্যারিসের ভদ্রলোক এর আগে ষ্টীমারে চড়েননি—কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার ঘনঘটা দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন দস্তুরমতোই। কি রকম করে প্যাডেল হুইল জল কাটছে সেটাও একটা তাঁদের কাছে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

সেণ্ট্ ম্যালো ক্রমশই ক্ষুদ্রতর হয়ে এল, অবশেষে দৃষ্টির যবনিকার ওপারে একেবারেই গেল মিলিয়ে।

সমুদ্র শান্ত। ডুরাঁদের ব্যবহারও খারাপ নয়। কিন্তু বেলা এগারোটার সময় থেকে সমুদ্রকে ক্রমশই যেন বিক্ষুব্ধ বলে মনে হতে লাগল। ডুরাঁদও ঠিক তার নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাচ্ছে তাও মনে হলো না। যে হাল ধরেছিল, ট্যাংগ্রোইল, সেই বোধ হয় এজন্য দায়ী—অতিরিক্ত মদ্যপানের দরুণ তার মাথার এবং হাতের ঠিক ছিল না।

অনেক পরে এটা কাপ্তেনের নজরে এল যে, ত্রুবাঁদ ভুল পথ নিয়েছে। তখনই তিনি গতির পরিবর্তন করলেন। এই দিকভুল করার অর্থ কয়েকঘণ্টা সময় নষ্ট,—যদিও ফেব্রুয়ারির সংক্ষিপ্ত দিনের পক্ষে তা সামান্য নয়। সমুদ্র তখন পর্যন্ত শান্ত। গোয়ার্ণসির প্যাসেঞ্জারের একটা ফিল্ড্‌গ্লাস ছিল, তাই চোখে দিয়ে সে দিগ্বলয় রেখার দিকে বারবার লক্ষ্য করছিল। আমেরিকানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বললে—"দূরে খানিকটা ঘোলাটের মত দেখাচ্ছে না? কী ওটা?"

দেখতে দেখতে হাওয়া এসে পড়ে, ঘোলাটেটা আরও বড় এবং বিস্তৃততর হলো। সমুদ্র কাঁচের মত মসৃণ হয়ে এল। তখনো সূর্য ছিল আকাশে, কিন্তু কিরকম বিবর্ণ আর ম্লান—তার কোন তাপ ছিল না।

টুরিস্ট বল্লে, "আবহাওয়া বদলাচ্ছে বলে আমার মনে হয়।"

প্যারিসের ভদ্রলোক বললেন, "বোধ হয় বৃষ্টি হবে।"

"কিংবা কুয়াশা।" বল্লে আমেরিকান।

গোয়ার্ণসির লোককে টুরিস্ট প্রশ্ন করলে, "এধারের সমুদ্র তোমাদের তো জানার মধ্যে?"

"নিশ্চয়ই।" গোয়ার্ণসির লোক জবাব দেয়, "আমরা তো এখানকারই"।

স্যাঁম্যালোর লোকটিও সায় দিল—"আমিও।"

আমেরিকান জিজ্ঞাসা কল্লে—"তা, হলে ভয়ের কিছু নেই তো পথে?"

"ভয়ের?" গোয়ার্ণসির লোক বললে, "না, যতক্ষণ খোলা সমুদ্রে আছি আর কুয়াশা নেই, ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু কুয়াশা হলেই—"

স্যাঁম্যালোর লোকটি যোগ করে—"বিপদ! চারিধারেই চোরাগোপ্তা পাহাড় টুকরো-টাকরো ছড়ানো আছে কিনা!"

হঠাৎ একটা বজ্রগর্জন শোনা যায়। কাপ্তেন ক্লুব্যাঁর কণ্ঠ। "মদ খেয়েছ তুমি? য়্যাঁ?"

প্রত্যেকের দৃষ্টিই সেদিকে যায়। ট্যাংগ্রোইল, প্রত্যুত্তরে ঘাড় হেঁট করে কেবল। দেখতে দেখতে কুয়াশায় চারিধার আচ্ছন্ন হয়ে আসে। জলে তেল পড়লে যেমন হয়, তেমনি একটি মুহূর্তে দিগ্বিদিকে যেন নিজেকে সে বিস্তৃত বলে বোধ হতে থাকে। এখনো প্রায় দেড় মাইল দূরে রয়েছে কুয়াশা—কিন্তু তা ছড়িয়ে এসে পড়তে আর কতক্ষণ?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই, জাহাজ কুয়াশার গ্রাসে গিয়ে পড়ে। এক মুহূর্তেই আশ্চর্য পরিবর্তন! সূর্য যেন চাঁদ হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই কাঁপুনি

ধরে, ওভারকোট গায়ে দিতে হয়। কুয়াশার মধ্য দিয়েই জাহাজ চলতে থাকে। কুয়াশা ভয়ের, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার আরো ভয়ঙ্কর। দিক্‌ভুলের জন্য যে কয়েকঘন্টা নষ্ট হয়েছে, তা পূরণ করে সন্ধ্যার মুখেই জাহাজকে পৌছতে হবে গোয়ার্ণসিতে। যেমন চিরদিন সে পৌঁচেছে। কাজেই জাহাজের গতিও দ্রুততর করতে হয় কুয়াশা সত্বেও।

বারো

ক্লুব্যাঁ এসে দাঁড়ায় ট্যাংগ্রোইলের পাশে। তখন সূর্য একেবারেই লুকিয়েছে, কুয়াশার গাঢ় পর্দা ভেদ করে তাকে আর দেখা যায় না। সকলেই নিস্তব্ধ। অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীত হয়ে প্যাসেঞ্জাররা কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করেছে।

হঠাৎ ক্লুব্যাঁ চেঁচিয়ে ওঠে, "মাতাল কোথাকার! তোমাকে নিয়ে চলবে না। জেলে দেওয়াই উচিত তোমায়। যাও; দূর হও এখান থেকে।"

ক্লুব্যাঁ নিজে হাল ধরে। ট্যাংগ্রোইল, ঘাড় হেঁট করে লজ্জায় মিলিয়ে যায় পিছনে।

গোয়ার্ণসির লোক বলে, "যাক্, আর ভয় নেই!"

বিকালের দিকে কুয়াশা একটু ফিকে হয়ে আসে, আবার সমুদ্র চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সূর্যও দেখা যায়।

গোয়ার্ণসির লোকটা তার ফিল্ড্‌গ্লাস-এর ভিতর দিয়ে দেখতে থাকে। হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসে ক্লুব্যাঁর কাছে।

"কাপ্তেন, আমরা হানোই-এর মুখে যাচ্ছি সোজা!"

"মোটেই না।" ক্লুব্যাঁ সংক্ষেপে বলে।

"জাহাজের মোড় ঘোরাও কাপ্তেন!" চীৎকার করে ওঠে গোয়ার্ণসির লোকটা।

"কেন বলো তো?"

"ফিল্ড্‌গ্লাসে আমি একটা খাড়া পাহাড় দেখলাম সামনে। নিশ্চয় হানোই!"

"কুয়াশারই গাঢ় অংশ, তা'ছাড়া কিছু না।" নির্বিকার ভাবে জবাব দেয় ক্লুব্যাঁ।

"না না! অমন উঁচু খাড়াই—হানোই না হয়ে যায় না। তুমি মোড় ঘোরাও, ভগবানের দোহাই, আমি বলছি।"

ক্লুব্যাঁ হালের হাতল ঘোরায় অবশেষে।

বলতে বলতে তুর্‌াঁদ এসে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগায়। এক দারুণ আওয়াজ! মড়মড় ক'রে সামনের হাল ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় ষ্টীমার। যাত্রীরা আছাড় খেয়ে পড়ে, ডেকের ওপর গড়াগড়ি যায়।

গোয়ার্ণসির লোকটা আকাশের দিকে দু'হাত ছোড়ে—"হানোই! হানোই! আমি তখনিই বলেছিলাম!"

সকলে চীৎকার করে ওঠে—"আমাদের সর্বনাশ হলো! মারা গেলাম আমরা।"

"কেউ মারা যাবে না। চুপ করো।" ক্লুব্যাঁর কঠোর এবং সংক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"থামো।"

নিগ্রো ইঞ্জিনীয়ার এগিয়ে আসে—"ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনঘরে জল ঢুকছে।"

এই ভীষণ ধাক্কার ফলে, ট্যাংগ্রোইলের নেশার ঝোঁক তখন কেটে গেছে; সে ছুটে এসে বলে—"জাহাজের খোলেও জল ঢুকছে।"

যাত্রীরা ভয়ে নির্বাক, টুরিস্ট তো মূর্চ্ছাই গেছে, আমেরিকান ভদ্রলোক কাঁপতে স্বরু করেছে।

ক্লুব্যাঁ নিগ্রোকে জিজ্ঞাসা করে—"কতক্ষণ আর জাহাজকে ভাসিয়ে রাখা যাবে?"

"পাঁচ-ছ'মিনিট বড় জোর।"

ক্লুব্যাঁ গোয়ার্ণসির লোকটার দিকে ফেরে "তুমি বলেছিলে না যে খাড়াইটা দেখতে পেয়েছিলে। সামনে তো তিনটে খাড়াই—এর মধ্যে হানোই কোন্‌টা?"

"ঐ মাঝেরটা, এক মিনিটের জন্য যখন কুয়াশা পরিষ্কার হয়েছিল তখনই আমি দেখেছিলাম ওকে।"

ক্লুব্যাঁ গম্ভীর শান্তভাবে আদেশ দিতে থাকে, লাইফ্‌বোট নামান হয়, একে একে যাত্রীরা গিয়ে ওঠে, তারপরে তুর্‌াঁদের নাবিকেরাও। ক্লুব্যাঁ, জাহাজের কাগজপত্র এবং কম্পাস ট্যাংগ্রোইলের হাতে দিয়ে দেয়। বলে, "বেশ, এইবার বোট ছাড়ো।" লাইফ্‌বোট থেকে চীৎকার ওঠে—"তুমি কাপ্তেন? তুমি?"

"আমি থাকলাম।" ক্লুব্যাঁ জবাব দেয়।

তেরো

এক মুহূর্তও নষ্ট করবার সময় নেই তখন। বোটসুদ্ধ সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—"এসো আমাদের সঙ্গে কাপ্তেন !"

ক্লুব্যাঁর সেই এক জবাব। কঠিন এবং সংক্ষিপ্ত। "আমি থাকলাম।"

ট্যাংগ্রোইল বলে, "আমিই দায়ী এই সর্বনাশের জন্য। তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি কেন থাকতে যাবে ?"

ক্লুব্যাঁ অটল। "আমি থাকলাম। আমার জাহাজ গেছে। কতক্ষণই ব: ভেসে থাকবে আর ? ঝড় ওকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলবে। আমার বেঁচে কি লাভ ? বাঁচতে আমি চাই না। আমার কর্তব্য শেষ পর্যন্ত করে যাব আমি ট্যাংগ্রোইল, তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।"

তারপর, একটু থেমে, কাপ্তেন তার শেষ আদেশ দেয়—"বোট ছেড়ে দাও তোমরা।"

বোট ছেড়ে দেয় তারা।

"কী চমৎকার মানুষ !" আমেরিকান বলে।

গোয়ার্ণসির লোক জবাব দেয়—"সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ !"

ট্যাংগ্রোইল তখন নীরবে অশ্রুপাত করছে। সে বলে, "যদি আমি কাপুরুষ না হতাম, তা'হলে ওর সঙ্গে থাকাই আমার উচিত ছিল।"

সে ফোঁপাতে থাকে।

নৌকা আস্তে আস্তে কুয়াশার গর্ভে অন্তর্হিত হয়। দাঁড় ফেলার শব্দ ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে আসে।

চৌদ্দ

ক্লুব্যাঁ একাকী। অর্ধমগ্ন দুরাঁদ—তার নিজের জাহাজ। তার মনের ভাব কী ? কী সে ভাবছে এখন ?

এসো, আমরা তার মনের কথা বোঝবার চেষ্টা করি।

পাহাড়ের ওপর, ভাঙা জাহাজে সে একাকী, মাথার ওপর মেঘের পরিবেশ, চারিধারে অগাধ সমুদ্র। মানুষের কণ্ঠ, মানুষের সঙ্গ থেকে অনেক দূরে, মরবার জন্যই সে পরিত্যক্ত।

জোয়ার আসছে—কিন্তু তার মনেও এসেছে আনন্দের জোয়ার।

এতদিনে সে কৃতকার্য হলো! তার কতদিনের স্বপ্ন, সফল হলো অবশেষে। সে আজ হ্যানোই-এ, আর, তার সঙ্গে পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁ।

জাহাজের সর্বনাশের আগাগোড়াই সে এঁচে রেখেছিল, সমস্তই প্ল্যান্ করা ছিল আগে থেকেই, তার এক চুল এদিক-ওদিক হয়নি। ঠিক এই রকমটাই যে ঘটবে তার দিব্যচক্ষে যেন দেখা ছিল। বহুদিন থেকে তার এই বাসনা আর চেষ্টা ছিল যে: এমন ভাবে নিজের খ্যাতি সে গড়ে তুলবে যে কেউ তার সাধুতায় কোনোদিন সন্দেহ করতে না পারে—এবং তারপর সুযোগ পাওয়া মাত্র এক চালেই হঠাৎ বড়লোক!

ব্যাতানকে যেদিন সে জুয়েলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে প্রথম দেখে সেই দিনই তার মাথায় এই বুদ্ধি খেলেছিল। তার কাছ থেকে টাকাটা বাগাতে হবে এবং তারপরই সরে পড়া। দুরাঁদকে ধ্বংস করে নিজেকে মৃত বলে চালানো খুব কঠিন হবে না, এবং চাই কি, নিজের একটা পুণ্যময় স্মৃতিও গোয়ার্ণসির মানুষদের চিত্তপটে চিরদিনের জন্য এঁকে দিয়ে যেতে পারে।

তার সমস্ত জীবন যেন এই দিনটির জন্যই প্রতীক্ষা করেছিল। এই জয়-গৌরবের আজকের দিনটির জন্য। "এতদিনে—হ্যাঁ এতদিনে!" আপন মনেই উচ্চারণ করে ক্লুব্যাঁ।

চারিদিকে সে তাকায়। হঠাৎ উচ্চহাস্য করে ওঠে। সে স্বাধীন! বড়লোক সে! এখনো যথেষ্ট সময় আছে, জোয়ার বাড়ছেই, দুরাঁদ এখনো পাহাড়ের উপরেই আটকানো, এখনি যে তলাবে এমন আশঙ্কা নেই। যাক, নৌকাটা যাক—যাক আরো কিছু দূর—খুব সম্ভব গোয়ার্ণসি পৌঁছতে হবে না নৌকার—ডুবে যাক, ডুবে গেলেই ভালো, মনে মনে কামনা করে ক্লুব্যাঁ।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তাকে কপটতার আশ্রয় নিয়ে থাকতে হয়েছে! —সাধুতার আর সৌজন্যের মুখোস প'রে কাটাতে কী যে খারাপ লেগেছে তার এতদিন? প্রত্যেকটি কথা ওজন করে বলতে হয়েছে, পাছে তার চালচলন অসতর্ক মুহূর্তে তা'কে ধরিয়ে দেয় আবার!

দারুণ রাগ ছিল তার সকলের ওপর। সমস্ত পৃথিবীর ওপর। কেন সে বড়লোক হয়ে জন্মায় নি? ভারী অন্যায়, এবং এর প্রতিশোধ তাকে নিতে হবেই। কার ওপর প্রতিশোধ? কেন, সবার ওপরেই। লেথিয়ারি? হ্যাঁ,

লেথিয়ারির ওপর তো বটেই। কেন সে এত বড়লোক? অত ভালোমানুষ কেন সে?

যাক, মুখোস ফেলে এতদিনে সে বেঁচেছে। সে খারাপ লোক, সত্যিই খুব খারাপ লোক, এ ভাবতে এবং আচরণে প্রকাশ করতে হবে না। সে হাঁপ ছাড়ে। র‍্যাতানের বদ্‌মাইসি তো তার কাছে ছেলেমানুষি বলতে গেলে। সাপ নিজের সন্ত-মুক্ত খোলসের দিকে যেমন তাকিয়ে দেখে, তেমনি আপন কীর্তিকে লক্ষ্য করে ক্লুব্যাঁ। তার হাসি পায়, ভয়ানক হাসি, আবার সে উচ্চহাস্য করে ওঠে। র‍্যাতানকে কেমন সে ঠকিয়েছে!

পনেরো

ক্লুব্যাঁর প্ল্যান সব ঠিক করাই ছিল। হানোই থেকে উপকূল খুব দূরে নয়, সাঁতরেই সে চলে যেতে পারবে এটুকু। আর-সকলের পক্ষে এই বাহাদুরি সম্ভব না হলেও, ক্লুব্যাঁর পক্ষে সম্ভব। বহুদিনের নাবিক সে।

তারপর? হানোইয়ের উপকূলবর্তী একটা পোড়ো বাড়িতে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র সবই সে মজুত রেখে এসেছে; সেখানেই সামুদ্রিক বোম্বেটেরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। সমস্তই ঠিক করা আছে। বোম্বেটেদের ঘুষ দিয়ে সে রাজি করিয়েছে, তারা তাকে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছিয়ে দেবে এবং একবার নতুন মহাদেশে পৌঁছতে পারলে, আর তখন তার ভাবনা কী! যে টাকা তার সঙ্গে আছে তা' থেকেই সে অগাধ সম্পত্তি করতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ তার চিন্তার জাল যেন ছিঁড়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য কুয়াশা পরিষ্কার, সেই সুযোগে সে স্পষ্ট দেখতে পায়—। য়াঁ! একি? এ তো হানোই নয়! এ যে ডুভার!

ডুভার! কি সর্বনাশ! হানোই থেকে উপকূল খুব দূরে নয়, কিন্তু ডুভার থেকে পাকা পনের মাইল। এতখানি সাঁতরে যাওয়া—? ক্লুব্যাঁ মাথায় হাত দিয়ে বসে।

হানোই ছিল আরো দূরে, আরো এগিয়ে—আরো আধঘণ্টা ষ্টীমার চালিয়ে গেলে তবে তারা হানোই পেত। কিন্তু সেই গোয়ার্ণসির লোকটা—সেই হতভাগাই তার সমস্ত ভুল করে দিল। ডুভারকে হানোই বলে চিনিয়ে সে-ই সমস্ত গোলমাল ঘটিয়েছে।

ভয়বিহ্বল নিষ্পলক নেত্রে ক্লুব্যাঁ তাকিয়ে থাকে ডুভার-খাড়াইয়ের দিকে।

একটু আগে সে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে, স্বাধীন হবার, বড়লোক হবার কল্পনা করেছে—আর এখন? এখন সে মৃত্যুদণ্ডের আসামী।

জাহাজ তো তাকে ছাড়তেই হবে। আজ রাত্রে ঝড় হবেই নির্ঘাৎ! তখন জাহাজে থাকলে তো নিশ্চয়ই মৃত্যু। ঐ খাড়াইয়ের ওপর আশ্রয় ছাড়া আর উপায় কি!

কিন্তু ঐ খাড়াইয়ের ওপরই বা কতক্ষণ—কতদিন সে থাকবে? এধার দিয়ে জাহাজের গতিবিধিও নেই যে আকস্মিক উদ্ধারের আশা করতে পারে সে। আর যদিই বা কোন জাহাজ যায় এদিক দিয়ে, কবে যাবে কে জানে, তার ঢের আগেই সে মারা পড়বে খাদ্যাভাবে আর দারুণ ঠাণ্ডায়।

ইতিমধ্যে বাতাসও জোর দিয়েছে। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। বাতাসের ধাক্কায়, কুয়াশা কেটে ছিঁড়ে খণ্ডখণ্ড হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে। সমগ্র সমুদ্র আবার পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে চোখের সম্মুখে। দুর্ঁাদের বুকে জন্তু-জানোয়াররা ভয়ানক হাঁক-ডাক সুরু করেছে, জাহাজের খোলে যতই জল বাড়ছে ততোই তাদের চীৎকারও বাড়ছে। জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও অনেকটা আলগা হয়ে এসেছে পাহাড়ের গা থেকে—এখন বড় গোছের একটা ঢেউয়ের অপেক্ষা কেবল!

হঠাৎ ক্লুঁব্যার চোখে প'ড়ে যায়—দূরে, বেশ দূরেই ঐ জেলেদের বোট না? উঁচু মাস্তুল বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এও হতে পারে, বোম্বেটেদেরই কোন বোট হয়তো—তা'হলে তো তার উদ্ধারের আশা আছে এখনো।

ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এখন কাজ ক্লুঁব্যার। কিন্তু এখান থেকে আগুন জ্বাললে ওরা কি দেখতে পাবে?—খাড়াইয়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ানো দরকার।

আর এক মুহূর্তও নষ্ট করে না ক্লুঁব্যা। পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। একটা লোহার টুকরো জলে ফেলে দেয়। না, জল এখানে গভীর বটে, ঝাঁপ দেওয়া নিরাপদ। ক্লুঁব্যা জামা-কাপড় খুলে ফেলে—এই নাবিকের পোশাকের কি দরকার তার? ক্লুঁব্যা তো মরে গেছে, সে এখন আলাদা মানুষ—তার আগের কোনই পরিচয় নেই। বোটের ওরা নিশ্চয়ই ওকে অন্য পোশাক দেবে আর তাছাড়া পোড়োবাড়িতে সবই তার তৈরি আছে। ক্লুঁব্যা একবার কেবল বেল্টে বাঁধা লোহার ছোট বাক্সটি টাইট আছে কিনা দেখে নেয়।

ক্লুঁব্যা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তলিয়ে গিয়ে যেমনি ভেসে উঠতে যাবে ওপরে, হঠাৎ জলের তলায়, কে যেন তার পা আঁকড়ে ধরে।

ষোলো

এখন গিলিয়াটের খবর নেওয়া যাক। দেরুশেৎ সম্বন্ধে চিন্তা-কাতর অবস্থায় তার বাড়ির কাছে তাকে ফেলে এসেছি আমরা।

লে-ব্রাভের দিকে সোজা সে পা চালাতে থাকে। রাস্তার সেই লোকটি যে রকম ইঙ্গিত করল, তা'তে ভাবনা না হয়ে যায় না। কিন্তু ব্যাপার কী? সারা সেন্ট্ স্যাম্পসন জুড়ে ফুসফাস গুজগাজ চলেছে, সকলেই চঞ্চল, স্ত্রীলোকেরা উচ্চকণ্ঠ, এখানে সেখানে দলপাকিয়ে দু'পাঁচজনের জটলা, কারু কারু মুখে বেশ হিংসুটে হাসি।

গিলিয়াট কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না—জিজ্ঞাসা করা তার স্বভাব নয়। সে সটান লে-ব্রাভের ভেতর গিয়ে ঢোকে। সমস্তই একসঙ্গে জানবার আগ্রহে সাহস তার বাড়ে—একেবারে বাড়ির মধ্যে চলে যায় সে।

তাছাড়া, বাড়ির সদর-দরজা উন্মুক্তই,—সকলেই যাচ্ছে ভেতরে। কারুরই বাধা নেই প্রবেশের। গিলিয়াটও সকলের সঙ্গে যায়।

রাস্তার সেই লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সেখানে।

সে কানের কাছে এসে চুপি চুপি বলে—"শুনেছ তো?"

"না।"

"রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলাটা আমি পছন্দ করি না। মানুষের দুর্ভাগ্যে মানুষের কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।"

"কী—শুনি?"

"দুরাঁদের সর্বনাশ হয়েছে।"

ঘরের মধ্যে সবাই নিচু-গলায় কথা বলছিল—রোগীর ঘরে যেমন করে লোক কথা বলে। পাড়া-প্রতিবেশী, রাস্তার লোক, জনতার দেখাদেখি নিতান্তই যারা কৌতূহলের বশে এসেছে—দরজার দিকটাতেই তারা ভিড় করেছিল। ঘরের অপর দিকে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন মে লেথিয়েরি, তাঁর পাশে একটা চেয়ারে বসে দেরুশেৎ, অশ্রুসিক্ত।

দেয়াল ঠেস দিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন লেথিয়েরি। তাঁর মাথায় নাবিকের টুপি—সাদা চুলের লম্বা একটা গোছা টুপি ছাড়িয়ে তাঁর গালের ওপর এসে পড়েছে। তিনি একেবারে নীরব এবং নিস্পন্দ, তাঁর দু'হাত দু'পাশে ঝুলছে—নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা কে জানে।

আর কী প্রয়োজন তাঁর বাঁচবার? দুরাঁদ চলে গেলে জীবন ধারণের আর

কোন মানেই হয় না। তাঁর আত্মা যেন সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছিল এবং সেইখানেই তার সলিল-সমাধি হয়েছে। তাঁর এ-বয়সে আর নতুন করে আরম্ভ করার সময় নেই,—আর তাছাড়া তিনি তো সর্বস্বান্ত।

দেরুশেৎ, বুড়োর একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে ধরেছিল। ঠিক হাত নয়, একটা বদ্ধমুষ্টির ওপর সান্ত্বনার হাত বুলোচ্ছিল দেরুশেৎ—আশার আভাস ছিল সেই আদরের মধ্যে; কিন্তু লেথিয়েরির বদ্ধমুষ্টির মধ্যে তা' পৌচাচ্ছিল কিনা সন্দেহ। বজ্রাহত হলে লোকে যেমন হয়ে যায়, তেমনি হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ঘরের মধ্যে অত লোকজনও তাঁর লক্ষ্যের ভিতর ছিল না—তারা যেন তাঁর থেকে দূরে, বহুদূরে বিরাজ করছে। দুঃখের অপার সমুদ্র মাঝে পড়ে যেন তাদের থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তিনি এক জগতের তারা অন্য জগতের।

ঘরে সবাই আলাদা দল পাকিয়ে চাপা-গলায় সংবাদ আদান-প্রদান করছিল। এ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছিল তা' এই: আগের দিন সূর্য ডোববার একঘণ্টা আগে, কুয়াশার মধ্যে, ডুভারের গায়ে ধাক্কা লেগে দুরাঁদ ডুবেছে। কাপ্তেন ছাড়া, নাবিক আর যাত্রীদের সকলেই রক্ষা পেয়েছে, তারা লাইফবোটে আশ্রয় নিয়েছিল। কাপ্তেন কিছুতেই জাহাজ ছেড়ে আসতে রাজি হয়নি। কুয়াশা কেটে যাবার পর, ভারী ঝড় ওঠে—সেই ঝড়ে তাদের নৌকা প্রায় যায়-যায় আর কি, কিন্তু তাদের বরাত জোর, কাশমীয়ার জাহাজ তখন যাচ্ছিল কাছ দিয়ে, তাদের উদ্ধার করে বাঁচায়। ঐ জাহাজেই ত' আজ সকালে এসেছে ওদের সেণ্ট্ স্যাম্পসনের সেই নতুন পাদ্রী। এই সর্বনাশের মূল হচ্ছে, ট্যাংগ্রোইল, হালের হাতল ছিল তার হাতে। ট্যাংগ্রোইলকে ধরে নিয়ে গেছে, সে জেলে এখন। ক্লুব্যাঁর ব্যবহার খুব চমৎকার! এমনটা দেখা যায় না। এই টেবিলের ওপর রয়েছে জাহাজের কাগজপত্র আর কম্পাস। সকলেই ক্লুব্যাঁর প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ—ক্লুব্যাঁ শেষাশেষি রক্ষা পেয়েছে সবাই এটা আশা করছিল।

সেই মুহূর্তে এক মাছধরা জাহাজের কাপ্তেন সেই কক্ষে প্রবেশ করল। সে লেথিয়েরির কাছে গিয়ে জানালে যে আজ সকালে সে দুরাঁদকে দেখে আসছে ডুভার-পাড়াইয়ের গায়ে লেগে থাকতে। সেখান থেকেই সোজা চলে এল সে লেথিয়েরিকে খবর দিতে।

আরো কি খবর নিয়ে সে এসেছে, জানবার জন্য ঘরের সবাই উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

সতেরো

জেলে-বোটের কাপ্তেন যা জানাল তা' এই: সকালের দিকে ঝড়ের ঝাপ্‌টা যখন কমে আসছে তখন গরু ভেড়ার আর্তনাদ গেল তার কানে—সেই চীৎকারের অনুসরণ করে ডুভারের কাছে গিয়ে সে দেখতে পেলে ডুর্‌াঁদের ধ্বংসাবশেষ। ভাঙা জাহাজের ওপরে কেউ ছিল বলে তার মনে হলো না, খাড়াইটাও সে ভালো করেই দেখেছে। ক্লুব্যাঁ যদি থাকত তা'হলে হয় সেই জাহাজেই কিম্বা ডুভারের ওপরে তাকে পাওয়া যেত—কারণ সহজে হাল ছেড়ে দেবার লোক সে নয়। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়, কোনো-না-কোনো জাহাজের কৃপায় খুব সম্ভব সে পরিত্রাণ পেয়েছে এবং সে জাহাজ যদি দূরের যাত্রী হয়, তা'হলে তার খবর এসে পৌঁছতেও সময় লাগবে—বেশ ভালো সময়ই।

জেলে-বোটের কাপ্তেন আরো বলল যে, ভাঙা জাহাজের কারুকে, উদ্ধার করবার নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যখন সে ফিরছে, তখন ঝড়ের শেষ ঝাপ্‌টায়, এক প্রকাণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কা ডুর্‌াঁদকে একেবারে ডুভারের ওপরে দুই খাড়াইয়ের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ডুর্‌াঁদের আর জলমগ্ন হবার আশঙ্কা নেই: এখন সে একেবারে পাহাড়ের ওপরে। তার টেলিস্কোপ দিয়ে বেশ খুঁটিয়েই সে দেখেছে, তার মনে হয়, ডুর্‌াঁদের কাঠামো ভেঙে গেলেও, ইঞ্জিন তার ভালো অবস্থাতেই আছে।

নিগ্রো ইঞ্জিনীয়ার ছিল সেই দলের মধ্যে, সেও কাপ্তেনের কথায় সায় দেয়। সে লেথিয়েরিকে উদ্দেশ করে বলে—"কর্তা! ইঞ্জিন এখনও ঠিক আছে!"

তখন ইঞ্জিন নিয়েই আলোচনা সুরু হয়। ইঞ্জিনই তো জাহাজের সব। ইঞ্জিন যদি ঠিক অবস্থাতেই থাকে তা'হলে তার কাঠামো তৈরি করে জাহাজ চালাতে কতক্ষণ? এখন যদি সেই ইঞ্জিনকে বাঁচিয়ে, কোনমতে আনানো যায়।

আনানো যায়! বলা সহজ, ভাবাও কঠিন নয়, কিন্তু আনানোই দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য কেন, হয়তো অসাধ্যই। এক-জাহাজ ভর্তি লোকজন পাঠিয়ে দেখা সমীচীন নয়, কেন না, কখন ঝড় ওঠে ঠিক নেই, তার ঝাপটায়, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে, তারও ডুর্‌াঁদের দশা হতে কতক্ষণ? আর ঐ অতটুকু খাড়াইয়ে অত লোকের জায়গাই বা কোথা?

যদি পারে, তা'হলে কেবল একজনের পক্ষেই পারা সম্ভব। একখানি ছোট্ট নৌকা নিয়ে সে যাবে, এবং নৌকাখানি পাহাড়ের গায়ে ভিড়িয়ে, কোনো বৃহৎ শিলার সঙ্গে বেঁধে, ডুভারের ওপরে আশ্রয় নিয়ে একা সে ইঞ্জিনকে মুক্ত করবে।

একাই তা'কে করে যেতে হবে—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, হয়
মাসের পর মাস—এই কাজ। সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে তা'কে ততোদিনে
খাদ্য আর পানীয়—এবং থাকতে হবে তাকে সেখানে নিঃসঙ্গ, একাকী।

তাছাড়া যে সে লোক হলে হবে না। জাহাজের কাঠামো থেকে ইঞ্জি
ছাড়িয়ে আনা যে সে লোকের কর্ম নয়! তা'কে কামারের কাজও জানতে
হবে এবং নাবিকেরও—একাধারে। তা' না হলে, ইঞ্জিন ছাড়িয়ে, তাকে
নৌকায় তুলে সেই নৌকা কায়দা করে বয়ে নিয়ে আসা সহজ কথা নয়। নয়ত
অত কাণ্ড করে শেষে মাঝসমুদ্রে নৌকাডুবি হয়ে সেও গেল, ইঞ্জিনও গেল!

এ কি যার তার কাজ? একাজ করতে যে এগুবে হয় সে সত্যিকারে
বীরপুরুষ, নয় এক আস্ত পাগল!

সকলেই ফিসফিস করে এবং ঘাড় নাড়ে। না, এরকম লোক পৃথিবীতে
থাকা সম্ভবপর নয়!

জেলে-বোটের কাপ্তেনও তাই সিদ্ধান্ত করেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
বলেন—"হ্যাঁ, যদি এরকম লোক কেউ থাকত—!"

বলেই তিনি ঘাড়-ঝাঁকি দেন।

দেরুশেৎ তার মাথা তোলে। "তা'হলে আমি তা'কে বিয়ে করতাম"
দেরুশেৎ বলে।

এক মুহূর্তের জন্য সব স্তব্ধ। তারপর অত্যন্ত বিবর্ণ এক যুবক এগিয়ে আসে
বলে, "সত্যি? তুমি তা'কে বিয়ে করতে, কুমারী দেরুশা?"

এই যুবক গিলিয়াট।

সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মে লেথিয়েরির ওপর। তাঁর মাথা যেন আরো
হয়ে ওঠে এবং চোখের তারায় এক অদ্ভুত আলোর দীপ্তি প্রকাশ পায়। তি
তাঁর টুপি খুলে মেজের ওপর ছুঁড়ে ফেলেন, নিজের বাহু তুলে গম্ভীর স্ব
বলেন: "হ্যাঁ, দেরুশা তা'কে বিয়ে করবে। আমার কথা দিচ্ছি আমি।"

আঠারো

জাহাজডুবির দুঃসংবাদ আসার পর আরো চল্লিশ ঘণ্টা কেটেছে—এর ম
মে লেথিয়েরি একটি কথাও মুখে তোলেন নি, এক পলকের জন্যও চো
পাতা বোজেন নি। আহার-নিদ্রা তাঁকে ছেড়ে দূরে পালিয়ে গেছে ে
কেমন একরকম নিঃঝুম মেরে গেছেন তিনি।

এই সময়ের মধ্যে কেবল তিনি দেরুশেতের কপালে একটা চুমু খেয়েছেন এবং একবার কেবল ক্লুব্যাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লুব্যাঁর কোন খবর নেই, বলা হয়েছে তাঁকে। তারপর আর একটিবারও কোন উচ্চবাচ্য তিনি করেন নি। কেবল ট্যাংগ্রোইলকে খালাস করে দিয়েছেন।

তারপরের দিনও এই ভাবেই কাটল তাঁর। বেশীর ভাগ সময় তিনি কাটালেন আধা দাঁড়িয়ে, আধা ভুরাঁদের অফিস-টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে। কেউ যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেছে তবেই তাঁর জবাব দিয়েছেন, নতুবা চুপচাপ। কিন্তু কোন লোকই আর সেদিন আসেনি তাঁদের বাড়ি। কেননা সবারই কৌতূহল মিটে গেছে এবং দুর্ভাগ্যের ছায়ার তলায় গিয়ে দাঁড়াতে সবারই যেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়!

তিনি আর দেরুশেৎ পাশাপাশি নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিক্রম করেছেন।

বিকালের দিকে তাঁর ঘরের দরজা একটিবার উন্মুক্ত হলো এবং দু'জন লোক ঢুকল তাঁর বাড়িতে। কালো পোশাক পরা দু'জন লোক। একজন বুড়ো আর একজন যুবক। দু'জনেরই মুখ গম্ভীর—দেখলেই মনে হয় গির্জার পাদ্রী-টাদ্রী, যাদের চিরকাল অপছন্দ করে এসেছেন মে লেথিয়েরি।

যুবকটির মুখ পাদ্রী-সুলভ গাম্ভীর্যপূর্ণ হলেও, একটা স্বতন্ত্র কমনীয়তা ছিল সেই মুখে। ধবধবে দুধে-আলতার রঙ্, সুশ্রী সুন্দর মুখ, মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মেয়েছেলের মত গাল আর নরম তার হাত। সব সময়েই কিছু যেন একটা চিন্তা করছে তারই প্রশান্ত গম্ভীরতার ছায়া তার মুখে। ভাবনার ফাঁকে কখনও যদি একটু হাসে, অমনি তার মুক্তার মত ঝকঝকে দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অপর লোকটি নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে দারুণ সচেতন। না হবেনই বা কেন? ঐ দ্বীপের তিনিই হলেন পাদ্রীদের মাথা। তাঁর ধর্মজ্ঞতার খ্যাতি ইংলণ্ডেও ছড়ানো। বড় বড় মহলে, লর্ড এবং ব্যারণদের মধ্যেও তাঁর বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। মাইনেও পান চমৎকার। সব সময়েই তাঁর পকেটে থাকে একখানা বাইবেল।

এই বৃদ্ধ ধর্মযাজকের নাম ডাঃ হেরোড্। অপরজন হচ্ছে এবিনেজার কড্রে, যাকে গিলিয়াট উদ্ধার করেছিল মরণের হাত থেকে। কড্রেকে সঙ্গে নিয়ে হেরোড্ এসেছেন দুরাঁদের দুর্ঘটনায় সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে।

লম্বা বক্তৃতা দিয়ে সহানুভূতি জ্ঞাপনের সূত্রপাত করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের মোট তাৎপর্য হচ্ছে এই:

তিনি দুর্‌াঁদের দুর্ঘটনা শুনেছেন। কিন্তু তাঁর বিবেচনায়, এই দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যের নয় মোটেই। এর একটা ভালো দিকও আছে। সম্পদে আমরা অহঙ্কারে ফুলে উঠি, ভগবানকে ভুলে যাই—কিন্তু দুর্ভাগ্যই আমাদের সর্বশক্তিমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মে লেথিয়েরি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বেশ ত', কি হয়েছে তা'তে? সম্পদের সর্বনাশ একদিন না একদিন আছেই। সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে যত মিথ্যা বন্ধু এসে জোটে—দুর্ভাগ্য তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মানুষ তখন একাকী দাঁড়ায়—ঈশ্বরের মুখোমুখি। তিনি শুনেছেন দুর্‌াঁদ তাকে পনেরো হাজার টাকা এনে দিত বছরে। অতো টাকার কি দরকার একজন লোকের? প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা কি চায় কোন জ্ঞানী? টাকা মানুষকে মোহান্ধ করে—ও যত যায় ততোই ভাল!

তাঁর বক্তৃতা অবাধে বয়ে চলে। মে লেথিয়েরি চুপ করে বসে থাকেন, শোনেন কিনা কে জানে!

বক্তৃতার সুর ক্রমশঃ জোর থেকে জোরাল হতে থাকে। ডাঃ হেরোড্ বলতে থাকেন—"মোহের মুখ থেকে যেন পালিয়ে আসি আমরা! অর্থকে অগ্রাহ্য করতে পারি। সম্পদ থেকে সন্ত্রস্ত থাকি এবং দুর্ভাগ্যকে প্রাণ খুলে হেসে বরণ করে নিতে পারি—" ইত্যাদি।

কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন-মে লেথিয়েরির যদি এখনও কিছু টাকা থেকে থাকে, তিনি তা' শেফিল্ডের অস্ত্রসজ্জার কারখানার শেয়ার কিনে অনায়াসে খাটাতে পারেন। বেশ লাভজনক ব্যবসা। শেফিল্ডের এই কারখানা রুশিয়ার জারকে অস্ত্রশস্ত্র চালান দিয়ে বেশ মোটা টাকা লাভ করছে—জার এখন পোলাণ্ডের বিপ্লব-দমনে ব্যস্ত কিনা!

এই সময়ে মে লেথিয়েরি ঈষৎ সজাগ হয়ে ওঠেন। বাধা দিয়ে বলেন তিনি—"জারকে আমার ভালো লাগে না।"

ডাঃ হেরোড্ প্রত্যুত্তর দেন-"বাইবেলে বলে, সীজারের জিনিস সীজারকে দাও। জারের জিনিস কেন জারকে দেবে না? আপনি বুঝি বিদ্রোহীদের পক্ষপাতী? সাম্রাজ্যবাদ আপনার পছন্দ নয়? সাধারণতন্ত্রই ভালোবাসেন? তবে এক কাজ করুন না কেন? আমেরিকান সাধারণতন্ত্রেও আপনার টাকা খাটাতে পারেন স্বচ্ছন্দে—ইংলণ্ডে খাটানোর চেয়ে তা'তে

আয় দেবে বেশী। টেক্সাসে একটা কোম্পানীর শেয়ার কিনুন না কেন? কুড়ি হাজার নিগ্রো খাটছে সেই কোম্পানীতে।"

মে লেথিয়েরি বলেন—"দাসপ্রথা আমি ভালবাসি না।"

ডাঃ হেরোড্ জবাব দেন—"ভগবানের নির্দেশেই দাসত্বপ্রথা এসেছে। তাঁরই স্বর্গীয় নিয়মে, মানুষেরা কেউ বা মনিব কেউ বা দাস।"

মে লেথিয়েরি চুপ করে থাকেন।

ডাঃ হেরোডের বক্তৃতা আবার সুরু হয়: "বেশ, আপনি যদি এতোই সর্বস্বান্ত হয়ে থাকেন যে ব্যবসায় খাটানোর পর্যন্ত টাকা নেই; আপনি তাহলে আর এক কাজ করুন না কেন? গবর্ণমেণ্টে চাকরির চেষ্টা করুন না তবে? বেশ ভালো ভালো চাকরিই খালি আছে। আপনি যদি অনুরোধ করেন, আমি আপনাকে সুপারিশ করতে পারি। এই ধরুন না, একটা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সম্প্রতি খালি হয়েছে, আমি অনায়াসেই আপনাকে সেটা পাইয়ে দিতে পারি। ডেপুটিরা একেবারে চুনোপুঁটি নন—বেশ সম্মানেরই পদ,—একটা জেলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! তাছাড়া জেলে ফাঁসি হবার সময়ে তাঁর উপস্থিতি চাই-ই—নইলে ফাঁসিই হবে না।"

"ফাঁসি আমার দু'চক্ষের বিষ।" মে লেথিয়েরি বলেন।

বার বার প্রতিবাদ শুনতে শুনতে ডাঃ হেরোড্ এবার খাপ্পা হয়েই ওঠেন। একটু কঠোর স্বরেই জবাব দেন—"মে লেথিয়েরি, পাপীর প্রাণদণ্ড ভগবানের অভিপ্রেত। বাইবেলে লেখা আছে স্মরণ রেখো,—একটা চোখের বদলে একটা চোখ, দাঁতের বদলে একটা দাঁত।"

মিঃ কড্রে ডাঃ হেরোডের রাগতঃভাবকে প্রশমিত করবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন,—"ওঁকে যা বলাচ্ছেন সেই কথা বলছেন উনি।"

"বলাচ্ছেন? কে বলাচ্ছেন?"

"ওঁর বিবেক।"

ডাঃ হেরোড্ তৎক্ষণাৎ তাঁর পকেট থেকে ছোট্ট বাইবেলখানা টেনে বার করেন। বেশ উচ্চ গলাতেই বলেন—"এই আমাদের বিবেক! এর বাইরে আমাদের আর কোন বিবেক নেই।"

দুই পাদ্রীর এই কথাবার্তার মাঝখানে লেথিয়েরি আবার নিজের দুঃস্বপ্নের মধ্যে ফিরে গেছেন—আবার তিনি আগের মত তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন, এদের কোন কথাই তাঁর কানে যাচ্ছে না আর।

ডাঃ হেরোড্, দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়ে কড্রেকে বোঝাতে চান বাইবেলের

বাইরে কোন মানুষের বিবেক থাকতে পারে না—এবং যদিও বা বিন্দুমাত্র থাকে সেই অনাবশ্যক বিবেকের গলা টিপে মারা একান্ত প্রয়োজন এই মুহূর্তেই।

ওঁদের এই আলোচনার মধ্যেই, মে লেথিয়েরি হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—"হ্যাঁ, আমারই তো দোষ! সমস্ত দোষই আমার।"

"আপনি কী বলতে চান?" ডাঃ হেরোডের প্রশ্ন হয়।

"আমি শুক্রবারই দুর্‌াঁদকে ফিরিয়ে আনতাম! সেইজন্যই এই রকম হলো! আমারই তো দোষ!"

ডাঃ হেরোড মিঃ কড্রের কানে কানে বলেন—"লোকটা কুসংস্কারে ভর্তি!" তারপর উচ্চকণ্ঠে নতুন উদ্যমে আবার আরম্ভ করেন—"মে লেথিয়েরি, শুক্রবার যে অপয়া এ ধারণাই আপনার ছেলেমানুষি। শুক্রবার আর সব বারের মতই ভালো, এমন কি বেশী ভালো অনেক সময়ে।" এই বলে তিনি একটার পর একটা উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেসব শুক্রবারে বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রে, চূড়ান্ত সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়েছিল।

মে লেথিয়েরির কানে এসব ইতিহাসের এক বিসর্গও প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েই থাকেন।

এর পর পাদ্রীদের যাবার সময় হয়, তাঁরা ওঠেন। লেথিয়েরি নড়েন না; বিদায় দিতে এগিয়ে যান না; কিছুই টের পান না তিনি।

দেরুশেৎ ওঠে, দেরুশেতই এগিয়ে যায় ওঁদের বিদায় দিতে। এতক্ষণ সে চুপ করে সমস্তই শুনছিল, কিন্তু একটি কথাতেও যোগ দেয়নি এবং একদৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল তরুণ যুবকটির সুন্দর মুখের দিকে। কড্রের কথা ভারি ভালো লেগেছিল তার।

বিদায়মুহূর্তে দু'জনেই তাকায় দু'জনের দিকে—হয়ত একটু হাসেও।

উনিশ

সেই রাত্রে একটিও জেলে-ডিঙি খুললো না গোয়ার্ণসিতে।

এর কারণ, মুর্গীরা সেদিন ডেকে উঠেছিল ঠিক দুপুর বেলাটিতেই। যখন এ রকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে, জেলেরা বলে, তখন আর নৌকা ছেড়ে কোনই লাভ নেই—বেরিয়ে একটা মাছও ধরতে পারবে না তুমি।

অথচ একটা নৌকা কিন্তু সেদিন ছাড়ল—সেই সাঁঝেই। একজন জেলে

সেদিন সূর্য ডোবার মুখেই নাকি দেখেছে একটা নৌকার মাস্তুলকে ধীরে ধীরে দিক্‌চক্রবালের দিকে মিলিয়ে যেতে।

এক জাহাজের কাপ্তেনও তাঁর ফিরতি-পাড়ির সময়ে দেখেছিলেন অমনি একটা নৌকা। নৌকায় একজন মাত্র আরোহী। একাই সে দু'হাতে দাঁড় টেনে চলেছে, সমুদ্রের ঢেউ ভেদ করে।

তার কিছু পরে, সমুদ্র-ধারের পথে গরুরগাড়ি চালাতে চালাতে একজন দেখল খুব দূরে সমুদ্রে একটা নৌকা আস্তে আস্তে তার পাল তুলল।

আরো খানিক পরে এক সরাইখানার মালিকের চোখে পড়েছে, পালতোলা একখানা নৌকা, যত মারাত্মক প্রস্তরাকীর্ণ সমুদ্রপথের গলিঘুঁজি পেরিয়ে তীরবেগে এগিয়ে চলেছে, কোথায় কে জানে!

এমনি গোয়ার্নসির বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন লোক দেখেছে সেই একই নৌকাকে। সবারই বিস্ময় জেগেছে মনে—কে এই নিঃসঙ্গ নৌকার দুঃসাহসিক যাত্রী? কে এ?

অবশেষে রাত্রি দশটার সময় যখন নিতান্তই চাঁদ উঠল, তার ঝাপ্‌সা আলোর আবছায়া ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে—তখন টেলিস্‌কোপ চোখে দিয়ে এক কোসট্‌গার্ড দেখেছিল, দূর সমুদ্রে, তার আর চাঁদের মাঝামাঝি, এক রহস্যময় মূর্তি—একটি নৌকার বুকে। হাওয়ায় মোড়া যেন তার তনু! কোনো পরী-টরী নয় তো? কোসট্‌গার্ডের গা ছমছম করে উঠেছিল।

সেই সন্ধ্যাতেই, সূর্য ডুবে যাবার একটু পরে, হল্‌দে রঙের মোজা পায়ে, বাদামী পোশাক পরা একটি ছোট্ট ছেলে গিয়েছিল গিলিয়াটের বাড়ি তার খোঁজে। সে অনেক ডাকাডাকি করল এবং ধাক্কা মারল দরজায়। গিলিয়াটের জানালা বন্ধ—কারো সাড়াশব্দ নেই সেখানে।

কুড়ি

সেই রহস্যময় নৌকাকে নিয়ে এবার আমাদের গল্প সুরু। নৌকার আরোহী—একমাত্র আরোহীটি যে কে, তা' তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ।

সে আর কেউ নয়, আমাদেরই গিলিয়াট। ডুভারের দিকে চলেছে সে।

অমনি ভাবে, সবাইকে লুকিয়ে, লোকের নজর বাঁচিয়ে, আড়ালে-আবডালে নৌকা চালিয়ে তার যাবার কারণ এই: কি করে না জানি তার

ধারণা হয়ে গেছল, যদি লোকে উদ্দেশ্য টের পায়, তা'হলে এই প্রাণান্তকর কাজে হয়ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটে যাবে। তার বিশ্বাস, কুমারী দেরুশেতের পাণিগ্রহণের জন্য প্রাণ দেবার লোকের অভাব নেই।

সারারাত্রি ধরে নৌকা চালিয়ে সে চলে।

আস্তে আস্তে পূর্বদিক ফরসা হয়ে আসে, চাঁদ ডুবে যায় পশ্চিমে, দূরদিগন্তে আলোকের আভা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রের বুকে তখনো অন্ধকারের কালিমা জমাট।

অবশেষে ডুভারের মুখে এসে পৌছায় গিলিয়াট। দেখতে পায় দুরাঁদকে, দু'টি খাড়াইয়ের মাঝখানে আটকানো—পাহাড় যেন বিজয়গর্বে দু'হাত তুলে, সবাইকে দেখাবার জন্যই উঁচুতে ধরে রেখেছে তার শিকার।

গিলিয়াট তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। তার গায়ে পশমের জামা, পায়ে রবারের জুতা—পুরু ট্রাউজার আর শক্ত-বোনা জার্সি পরণে। সঙ্গে আছে মস্ত এক ব্যাগ বিস্কুট—এক বস্তা ময়দা, এক ঝুড়ি শুকনো মাছ—আর এক জালা পানীয় জল। কিছু রুটি এবং মাংসও। তার মা'র দেওয়া ফুল-কাটা তোরঙ্গের মধ্যে আরো পশমী জামা, গরম কোট, আর যদি হঠাৎ ভারী ঠাণ্ডা পড়ে যায় তার জন্যে আসল ভেড়ার চামড়া। নৌকা করে এ-সবই সে নিয়ে এসেছে। দুরাঁদকে উদ্ধার করতে কতদিন লাগবে কে জানে! ততদিন এ-সবেরই তো দরকার।

যন্ত্রপাতির মধ্যে সে এনেছে কামারের হাতুড়ি, কুড়ুল আর কাটারি, একখানা করাত- মোটা কাছির মত অনেকখানি দড়ি এবং একটা হুক—দরকার হলে কোন কিছুতে আটকাবার জন্যে। আর একটা নোঙরের মত জিনিস। তাড়াতাড়িতে এর বেশী আর কিছু আনতে পারেনি।

আস্তে আস্তে গিলিয়াটের নৌকা ডুভারের কাছে এসে ভিড়ে।

জোয়ারের জল তখন নেমে যাচ্ছে—ভাঁটার টান সুরু হয়েছে। গিলিয়াটের সুবিধাই, বলতে গেলে।

জল সরে গিয়ে তখন ডুভারের সামনের চড়াটা বেরিয়ে পড়েছে। সেইখানে নৌকা লাগায় গিলিয়াট। জুতো খুলে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি। নৌকাকে দড়ি দিয়ে বাঁধে এক বড় ভারী পাথরের সঙ্গে—তারপর অতি সন্তর্পণে, পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ফিরে সে গিয়ে দাঁড়ায়—দুরাঁদের ঠিক নিচেই। সেই দুই খাড়াইয়ের ফাঁকে—যার বিশাল কবলের মধ্যে দুরাঁদ আটকা পড়েছিল।

একুশ

দিনের পর দিন যায়, গিলিয়াট কাজ করে চলে। তার কুড়ুল আর কাটারি নিয়ে, হাতুড়ি আর করাত দিয়ে। জেলে-ডিঙির যে কাপ্তেনটি মে লেথিয়েরিকে খবর দিয়েছিল, ঠিক কথাই বলেছিল সে; ইঞ্জিনের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি, তাছাড়া, প্যাডেল-হুইল এবং জাহাজের আরো অনেক অংশ ভালো অবস্থাতেই আছে। এখন এই ইঞ্জিনটাকে ডুরাঁদ থেকে খুলে আনাই হচ্ছে তার কাজ, এবং জাহাজের আরো যতটা সম্ভব সে ছাড়িয়ে আনতে পারে।

গিলিয়াট কাজ করেই চলে। পিঁপড়ের মত পরিশ্রম করে সারাদিন—রাত্রে সে ঘুমোয়, খাড়াইয়ের মাথার ওপর গিয়ে। বেশ শীত পড়ে রাত্রে—সব জামা-কাপড়-কোট্ জড়িয়ে ভেড়ার চামড়া মুড়ি দিয়ে তাকে ঘুমোতে হয়। না হলে ঠাণ্ডায় জমে যাবার সম্ভাবনা।

এইভাবে দিনের পর দিন চলে যায়। সমুদ্র ফেঁপে ওঠে জোয়ারে, আবার ভাঁটার টানে কমে আসে; যেন বৃহৎ এক প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস! গিলিয়াট কাজ করেই চলে।

খাড়াই এবং পাহাড়ের চারধারও ইতিমধ্যে ঘুরে-ফিরে তার দেখা হয়ে গেছে। পাহাড়টার স্থানে স্থানে গভীর গুহার মত—জোয়ারের সময় জলে ডুবে যায়, অন্য সময় বেরিয়েই থাকে। যত সামুদ্রিক কাঁকড়ার বাসস্থান সেইসব গুহায়। ভাঁটার সময়ে, গিলিয়াট তার কাজ ফেলে রেখে, এক একবার সেই সব গুহার ধারে চলে যায়—সামুদ্রিক কাঁকড়ার সন্ধানে। গোটাকতক সংগ্রহ করে আনে, সেইগুলো পুড়িয়ে তার সেদিনকার মত আহারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

এই কাঁকড়াতেই তার চালাতে হচ্ছে আজকাল। কেননা খাদ্যদ্রব্য সে যা এনেছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে এতদিনে। ময়দার বস্তার চিহ্নও নেই, বিস্কুটও খুব সামান্যই অবশিষ্ট। খাবার জলও তার ফুরিয়ে গেছল, তবে জলকষ্টে পড়তে হয়নি তাকে। একটা পাখীকে একদিন খাড়াইয়ের মাথায় জলপান করেতে দেখে, সেইখানে খুঁজতে গিয়ে সামান্য একটা প্রাকৃতিক জলাধার সে আবিষ্কার করেছে। একটা নাতিবৃহৎ গর্তে বৃষ্টির জল জমে ছিল; পাখীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে সেই জলেই সে চালাচ্ছে।

ক্রমশঃ মার্চ মাসটা গোটাই কেটে গেল। ভগবানের দয়াই বলতে হবে,

কেননা সারা মাসে একদিনও ঝড়-বৃষ্টির সূত্রপাত দেখা যায়নি—ঝড়-বৃষ্টি হলে গিলিয়াট কি করত বলা যায় না। নিঃসঙ্গ খাড়াইয়ের মাথায়, অনাবৃত আকাশের নিচে ঝড় ও বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় কি অবস্থা হত তার কে জানে!

আস্তে আস্তে এতদিনে গিলিয়াট ইঞ্জিনটাকে অনেকটা ছাড়িয়ে আনতে পেরেছে। দ্বিগুণ বলে, চতুর্গুণ উৎসাহে সে কাজে লাগে আবার।

মার্চ কেটে গিয়ে এপ্রিল পড়ে।

প্যাডেল-হুইলকে খুলতে পেরেছে গিলিয়াট।

আস্তে আস্তে একদিন সে ইঞ্জিনটাকেও ছাড়িয়ে আনে। এপ্রিলও তখন কেটে যেতে বসেছে।

এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গিলিয়াট অবসন্ন বোধ করে। তার দিকে তাকিয়ে, তাকে আর চেনা যায় না। রোগা—জীর্ণ-শীর্ণ দেহ—অনাহারে, সামান্য আহারে এবং কদাহারে বিশুষ্ক চেহারা—মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখময় দাড়ি,—খালি পা।

পোশাক-পরিচ্ছদও তার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। গরম কোটের চিহ্নমাত্রও নেই, পশমী জামার অবস্থাও প্রায় তাই। কেবল একটি মাত্র শার্ট —অনেকটা ভদ্রলোকের মতো। হাতুড়ি আর কাটারির ঘা লেগে শরীরের জায়গায় জায়গায় ক্ষত হয়েছে। শীতার্ত, তৃষিত, ক্ষুধাতুর।

এর মধ্যে একদিন সামান্য একটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। সেই বৃষ্টির পর থেকেই যত সামুদ্রিক মশা এসে জুটেছে। ভীষণ তাদের কামড়। সারারাত ঘুমোতে পারে না গিলিয়াট মশার জালায়। সকালে যখন ওঠে তার সর্বাঙ্গ তখন ফোলা, জ্বর-জর ভাব—বেদনার অন্ত নেই।

কিন্তু গিলিয়াট অবসাদ জানে না—ক্লান্তি জানে না। পরাজয় মানতে সে প্রস্তুত নয়। অসম্ভবকে সে সম্ভব করবেই।

সে করেছেও তাই।

ইঞ্জিন সে খুলে এনেছে দুরাঁদের পাঁজরার ভেতর থেকে। এপ্রিলও শেষ হয়ে এল, এইবার তার যাত্রা স্বরু করলেই হয়।

অর্ধেক রাজত্ব না হোক, রাজকন্যার মত কুমারী দেরুশা তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে যে!

বাইশ

এইবার আমরা ইঞ্জিন উদ্ধারের শেষ-দৃশ্যে উপস্থিত হয়েছি।

গিলিয়াট দুরঁাদের অংশ-প্রত্যংশ সমস্তই খুলে ছাড়িয়ে আলাদা আলাদা করে রেখেছে। ইঞ্জিনের তলার হালকে সে চৌকো করে কেটেছে—ইঞ্জিনের সঙ্গেই নামিয়ে আনবে। দুরঁাদের কেবল কাঠামো বাদে আর যা কিছু প্রয়োজনীয় সবই সে সঙ্গে নিয়ে যাবে ; কোন্‌টা কাজে লাগবে কোন্‌টা লাগবে না, তার কিছুই তো তার জানা নেই। এইসব খুলতে, ছাড়াতে, আলাদা করতে আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে তার জীবনশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে—যন্ত্রপাতিও এসেছে ক্ষয়ে।

কিন্তু আজ তার প্রাণান্ত পরিশ্রম সার্থক, সে সফল হয়েছে তার দুঃসাহসিকতায়।

গিলিয়াট ঠিক করলে, আজ যখন জোয়ারের বান ডাকবে এবং জল ছাপিয়ে উঠবে সেই খাড়াই-বরাবর, তখন সে জাহাজের সর্বপ্রধান, সবচেয়ে সেই ইঞ্জিনের ভারী অংশ নামাবে তার বোটে। সে নিজের বোটটাকে চালিয়ে নিয়ে খাড়াইয়ের ঠিক নিচেই খাড়া করে।

দুরঁাদের ষ্টোর-রুমে দুটো বড় বড় সিন্দুক ছিল—সেই সিন্দুক দুটোয় সে বোঝাই করল হুইলের বিভিন্ন অংশ—এবং আরো যা যা জাহাজের কলের খুচরা খুচরা টুকরাটাকরা ছিল সেই সমস্ত।

তারপর যখন জোয়ারের উচ্ছ্বাসে জল ছাপিয়ে উঠে তার নৌকাকে তুলে ধরল খাড়াইয়ের মুখে, তখন সে মোটা-দড়িতে বেঁধে, অতি কৌশলে আস্তে আস্তে, ইঞ্জিনটাকে নামাল নিজের বোটে। বোটের ঠিক মাঝখানে-যাতে ব্যালেন্স ঠিক থাকে। ইঞ্জিনটাকে লোহার তার দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল বোটের সঙ্গে।

তারপর সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই ইঞ্জিনের দিকে—আনন্দে আত্মহারা হয়ে। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সত্যিই কি সে অসাধ্য সাধন করেছে—সত্যিই?

তেইশ

এইবার তার যাত্রা সুরু করলেই হয়। এতদিন—এতদিন পরে আবার বাড়ির দিকে—গোয়ার্ণসির দিকে—কুমারী দেরুশার দিকে।

এক মুহূর্ত আর দেরি সইছিল না। উজ্জ্বল সুন্দর সন্ধ্যা—ডুবন্ত সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল করছে সারা দিক—আর কেন সে দেরি করবে? এখন যদি রওনা হতে পারে তা'হলে ভোরের মুখে ভিড়বে সাঁ্যামালোয়—এবং কালকেই গোয়ার্ণসিতে।

কিন্তু একটা মুস্কিল বাধছিল। জোয়ারের মুখে তার বোট বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে, তার ফলে ইঞ্জিনের লম্বা ফানেলটা আটকে গেছে দুর্‌ঁাদের ধ্বংসাবশেষ কাঠামোর ফাঁকে। ভাটার টানে জল না নেমে গেলে—এবং সেই সঙ্গে তার নৌকাও অবনমিত না হলে, ইঞ্জিনের ফানেলকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

অতএব তা'কে অপেক্ষা করতেই হল। আজকের রাত্রের মতো। কাল সকালেই তার যাত্রা হবে সুরু।

যাক, বাধ্য হয়ে যে তাকে বিশ্রাম করতে হল সে তার পক্ষে বোধ হয় ভালোই—কেননা বিশ্রামের তার দরকার—এবং খুব বেশী ভাবেই।

গিলিয়াট তার জিনিসপত্র বার করে—বিছানা পাতে। সেলমাছ পুড়িয়ে তার সামান্য আহার সমাধা হলে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে সে।

এতদিন পরে সে নিশ্চিন্তমনে অকাতরে নিদ্রা যায়।

চব্বিশ

সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন খিদেয় চাঁই চাঁই করছে তার পেট। এতদিন সে যেন ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলেই ছিল—কাজ, কেবল কাজ ছাড়া আর কোন চিন্তাই ছিল না তার মনে; কিন্তু আজ সকালে যেন বিশ্বগ্রাসী খিদে তার পেটে এসে বাসা বেঁধেছে।

কিন্তু খাদ্য—অন্য সব দিনের মত, যা-তা খাবার নয়—আজ কিছু সুখাদ্যই তাকে সংগ্রহ করতে হবে।

সুখাদ্যের সন্ধানে বাহির হলো সে।

পাহাড়ের এধারে ওধারে ঘুরে, যেধারে সামুদ্রিক গুহা ছিল, সেই ধারটায় সে গেল।

অকস্মাৎ সে দেখতে পেলে এক বিরাটকায় কাঁকড়া,—দেখবামাত্রই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্র কিনারায়। আঃ, আরেকটু হলেই কাঁকড়াটাকে সে ধরেছিল আর কি! তা'হলে ওটাকে পুড়িয়ে, কিংবা সিদ্ধ করে, ওর মাংসে কি চমৎকার ভোজটাই না হতো!

গিলিয়াট কিনারার ধার দিয়ে তার অনুসরণ করে চলে। কাঁকড়াটা অবশেষে একটা গুহার মধ্যে গিয়ে অন্তর্হিত হয়।

নাঃ, কাঁকড়াটাকে অত সহজে পরিত্যাগ করা সঙ্গত হবে না। গিলিয়াটও যাবে ঐ গুহার মধ্যে, ঢুকবে ওর ভেতরে ডুব-সাঁতার দিয়ে, খুঁজে বের করে আনবেই ওটাকে—তারপর ওকে পাঠাবে যথাস্থানে—তার নিজের উদরের গহ্বরে। তা না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি হচ্ছে না।

গিলিয়াট, কেবল ট্রাউজার ছাড়া, আর সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে—ট্রাউজারটাকেও গুটিয়ে আনে হাঁটু পর্যন্ত। তারপর ছুরিটাকে নেয় দাঁতের মধ্যে চেপে—নিজে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের মধ্যে।

জল খুব বেশী ছিল না—তার কাঁধ-বরাবর। সে আস্তে আস্তে ঢোকে পাহাড়ের সেই ফাঁকটার ভেতরে। হেঁটে যাওয়া চলে। মসৃণ পাথরের দেয়াল ঘেঁসে ঘেঁসে অনায়াসে। কিন্তু কাঁকড়াটাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। চারধারে পাহাড়ের ঘোজে আলোও কম—কিন্তু তার চোখ অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আবছায়ায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ জলের মধ্যে কে যেন তার হাত পাকড়ে ধরে। রোগা, চ্যাপ্টা কী যেন, আর কী হিম-শীতল তার স্পর্শ!—জিনিসটা চটচটেও বটে। এক মুহূর্তের মধ্যে সে গিলিয়াটের হাত পাকড়ে, বাহু জড়িয়ে, তার কাঁধ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। বগলের তলায় জিনিসটা যেন কুণ্ডলী পাকাতে থাকে।

গিলিয়াট নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়,—পারে না। পিছনে হটে আসার চেষ্টা করে, তাও অসম্ভব।

বাঁ হাত তার খোলাই ছিল, তাই দিয়ে সে মুখের ভিতর থেকে ছুরিটাকে বাগিয়ে আনে, পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে ওর ধারালো ফলা উন্মুক্ত করে। সেই সঙ্গে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পায়, কিন্তু সব বৃথাই, যা বাহুপাশে তাকে বেঁধেছে তা' চামড়ার মতো মসৃণ হলেও, ইস্পাতের মতো কঠিন—আর শীত-রাত্রের মত শীতল।

হঠাৎ অদৃশ্য জীবের আরেক বাহু যেন তীরবেগে ছুটে আসে—তার নগ্ন-

দেহকে বেষ্টন করে। অদ্ভুত, অসহ্য, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা বোধ হয় গিলিয়াটের এ রকম কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা এর আগে আর হয়নি। তার যেন মনে হয়, অসংখ্য ছোট ছোট মুখ তার সর্বাঙ্গ ঘিরে রক্ত শোষণ করছে!

তৃতীয় বাহুও বেগে বেরয়—তার পাঁজরাকে জড়ায়। চতুর্থ বাহু তার শরীরের নিম্নাংশকে জড়িয়ে ধরে। এইভাবে জড়ীভূত হয়ে পড়ে গিলিয়াট। এক পা'ও নড়তে চড়তে পারে না সে।

ছুরি দিয়ে বাহুপাশ কেটে ফেলার চেষ্টা করে—কিন্তু ছুরি বসে না তার গায়ে। পিছলে ফিরে আসে বসানোর সঙ্গেই।

এইবার পঞ্চম বাহু বেরিয়ে এসে গিলিয়াটের বুক জাপটে ধরে—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও যেন রোধ হয়ে আসে তার।

সব বাহুগুলোই যেন এক জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসছে।—মনে হয়, এদের কেন্দ্রে আছে রহস্যময় এক জীব, গুহার গর্তে লুকিয়ে—অন্ধকারের মধ্যে অগোচর হয়। তার বাহুগুলি গিলিয়াটকে নানা পাকে ঘিরে, কুণ্ডলী পাকিয়ে, চাপ দিয়ে যেন গুঁড়ো করে ফেলার মতলব করেছে।

গিলিয়াটের দম বন্ধ হয়ে আসে।

পঁচিশ

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড গোলাকার বস্তু ছুটে বেরিয়ে এল গুহার গর্ত থেকে—যে পাঁচটা বাহুপাশ বজ্রবাঁধনে তাকে জড়িয়েছিল, সেই পাঁচটি বাহু সেই বস্তুর সঙ্গেই জড়িত, গিলিয়াট লক্ষ্য করল। সে আরো দেখল, যে এখনো আরো তিনটি বাহু তার অবশিষ্ট আছে। সেই গোলাকার জীবের জলজলে চোখ দুটো প্যাট্ প্যাট্ করে সোজা গিলিয়াটের দিকে তাকিয়ে।

গিলিয়াট চিনতে পারলে যে এই জীবটি হচ্ছেন—অক্টোপাস্।

সে আরো বুঝতে পারলে যে এই সুন্দর প্রাকৃতিক গুহাটি এই অক্টোপাসেরই বিহারক্ষেত্র। সে তার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেছে, তার ফলে, মাকড়সার জালে মাছি পড়লে যেমন হয়, তাই হয়েছে এখন তার অবস্থা। অযাচিত ভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখন সে অক্টোপাসের অতিথি! কিন্তু অতিথির অবস্থা থেকে খাদ্যে পরিণত হতে হয়ত তার বেশী দেরি নেই।

অক্টোপাসটা তার বাকি তিনটা হাতে পাহাড়ের গা আঁকড়ে ছিল এবং

এদিকে পাঁচহাত গিলিয়াটকে জড়িয়ে, তার অগুন্তি সূচীযুক্ত মুখে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন নিঙড়ে শুষে নিচ্ছিল।

পিছল পাথরে পা রেখে দাঁড়ানোই দুরূহ, তার ওপরে তার ডানহাত তো কাজের বাইরে—অক্টোপাসের আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে একেবারেই নিশ্চল। এটা সে বুঝেছিল যে এর কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব—যতই সে চেষ্টা করবে ততোই আরো ঘনীভূত হয়ে জড়িয়ে পড়বে তার পাকে। এখন, তার পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে তার বাঁ হাত—এ পর্যন্ত যা অক্টোপাসের বাঁধনে বাঁধা পড়েনি।

গিলিয়াট বাঁ হাতে ছুরিটাকে উঁচিয়ে ধরে। সৌভাগ্যক্রমে তার বাঁ হাত ছিল ডান হাতের মতই জোরালো আর কাজের।

পরমুহূর্তেই সেই সুযোগ আসে গিলিয়াটের কাছে। জন্তুটা তার ছ-নম্বর হাত দিয়ে গিলিয়াটের পা পাকড়ে ধরে—আর মাথাটাও অনেক এগিয়ে আনে গিলিয়াটের দিকে, তার বাঁ হাতের কাছাকাছি—ছুরির নাগালের মধ্যে।

এই সুযোগ হয়ত বেশীক্ষণ থাকবে না। গিলিয়াট তৎপর হয়ে ওঠে, তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত জোর দিয়ে, ছুরিটা বেঁকিয়ে, এক কোপ বসায় জন্তুটার একেবারে মাথায়—দুটো চোখ তার উপড়ে দেয়, মাথাটাও খসিয়ে আনে ধড় থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে অক্টোপাসের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। তার অসংখ্য মুখের শোষণের ক্ষমতা লোপ পায়, বাহুগুলি অবশ হয়ে আসে—ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত খসে পড়ে সে।

আর কয়েক মুহূর্ত দেরি হলেই জীবনের আশা ছিল না গিলিয়াটের। আর একটু হলেই তার দম আটকে আসত। যাক—ঠিক সময়েই সে ঠিকমত আঘাতটি দিতে পেরেছে। ধড় এবং মাথা এই দু'ভাগে—দ্বিখণ্ডিত হয়ে জানোয়ারটিকে পড়ে থাকতে সে দেখে তার পায়ের সামনেই। যদিও তখন ভয়ের আর কোন কারণই ছিল না—তবুও তাড়াতাড়ি সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে।

তার ডান হাত, তার সারাদেহ, তখন কঠোর পেষণের ফলে রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গে দু'শোর বেশী ছোট ছোট ক্ষত—সেই সব ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। সে সমুদ্রের গভীরতার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ডুব মারে, যেখানে জল আরো বেশী লোনা। লোনা জল দিয়ে ক্ষতের মুখগুলি রগড়ায় —ক্রমশই তার যন্ত্রণাবোধ কমে আসতে থাকে।

ডুব দিতে দিতে গিলিয়াটের উৎসাহ বোধ হয়—সাঁতরাতে সাঁতরাতে গুহার ভেতরের দিকে সে যায়।

উৎসাহ না হবে কেন? গতকল্যই সে অসাধ্যসাধন করেছে, আর আজ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এইমাত্র তার পরিত্রাণ হোলো—এবং আগামীকাল?

হয়তো, কুমারী দেরুশার সুকোমল শুভ্র পদ্মফুলের মতো হাত, তার জন্যই অপেক্ষা করে আছে ; আগামীকাল সেই নরম মিষ্টি হাতের অধিকারী সে-ই হবে !…কে জানে ?

সুতরাং উৎসাহিত হয়ে, সে এধারে-ওধারে সাঁতরায়। জলের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য করা যায় না, তা নইলে, হয়ত তাণ্ডবনৃত্যই সুরু করতো সে !

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে সে ভীষণভাবে চম্‌কে ওঠে। সাঁতরাতে সাঁতরাতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে যায়—গুহার একটা পার্বত্য অংশে। সেখানে সে দেখতে পায়, একটা হাস্যময় মুখ—তার দিকে তাকিয়েই হাসছে !

এই নির্জন জায়গায় হাসি-হাসি মানুষের মুখ !…ও আবার কার ?

গিলিয়াট অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে জীবনে—সহজে ভয় খাবার ছেলে সে নয়। সে গিয়ে দেখবে—কি ব্যাপার ! জল ছেড়ে সে ওঠে,—পাহাড়ের কিনারা বেয়ে, ধার দিয়ে আস্তে আস্তে গুহার সেই দিকটায় গিয়ে সে পৌঁছায়।

হাসছিল—এক মরা মানুষের একটা পচা বিকৃত মুণ্ড ! কেবল মুণ্ড নয়, মানুষের সম্পূর্ণ একটা কঙ্কালই শুয়ে সেই গুহার ভিতরে।

আর সেই কঙ্কালের আশেপাশে—যত রাজ্যের কাঁকড়া। কাঁকড়াদেরই আস্তানা ওটা।

এ থেকে গিলিয়াট একটা আন্দাজ পায়। যে-কারণেই হোক লোকটা এধারে এসে, তার মতোই অক্টোপাসের কবলে পড়ে এবং শেষে মারা যায়। তারপর তার যা অবশিষ্ট ছিল হাড় বাদে সবই প্রায় কাঁকড়ারা আহার করে শেষ করেছে !

কিন্তু লোকটা কেনই বা মরতে এসেছিল—এখানে ?

ছাব্বিশ

হঠাৎ গিলিয়াট দেখে, কঙ্কালটার কোমরে চামড়ার বেল্টের মতো কি যেন একটা আটকানো। তার দেহের আর কোথাও পোষাকের চিহ্নও—নেই, বোধ হয় জলে ঝাঁপ দেবার আগে দিগম্বর হয়েই নেমেছিল লোকটা।

একটু চেষ্টা করতেই বেল্টটা কোমর থেকে খুলে যায়।

বেল্টের একধারে একটা ছোট্ট লেদার-কেস্। কেস্‌টা টিপে তার ভেতরে শক্ত কোন জিনিস আছে অনুভব করে গিলিয়াট। খুলে দেখে, তার ভেতরে ঝক্‌ঝকে সোনার মোহর—কুড়িটা; আর তার সঙ্গে শক্ত করে আঁটা একটা বন্দির ডিবের মতো—লোহার ডিবে।

ছুরির ফলা দিয়ে ডিবেটা খোলে গিলিয়াট।

ভেতরে দেখতে পায় কতকগুলো ভাঁজকরা কাগজ—কাগজগুলো একটু সাঁৎ-সেতে হয়েছে বটে, কিন্তু নষ্ট হয়নি। আস্তে আস্তে সে ভাঁজ খোলে কাগজগুলোর।

তিনটে ব্যাঙ্ক নোট—এক একটা হাজার পাউণ্ডের—বিলাতের ব্যাঙ্কের ফরাসী টাকায় ভাঙালে তিনখানায় দাঁড়াবে পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁ।

গিলিয়াট নোটগুলো ভাঁজ করে ডিবের মধ্যে রাখে। কুড়িটা গিনিও লেদার-কেশে রেখে দেয়। তারপর বেল্টটা পরীক্ষা করে,—দেখতে পায় তার ভেতরের দিকটায় টেকসই কালির দাগ দিয়ে লেখা একটা নাম। নামটা সে পড়ে—"সিউওর ক্লুব্যাঁ।"

লেদার-কেস্ এবং নস্যির ডিবে বেল্টের সঙ্গেই এঁটে রাখে। তারপর সব একসঙ্গে তার পকেটে ভরে, কঙ্কালের সান্নিধ্য সে পরিত্যাগ করে। কঙ্কালের, কাঁকড়ার এবং মৃত অক্টোপাসের।

তারপর গিলিয়াট ফিরে আসে নিজের নৌকায়। কয়েকটা সেল্‌মাছ পুড়িয়েই তার আহার সমাধা হয়। কাঁকড়া অজস্রই ছিল—কিন্তু কাঁকড়ার প্রতি আর রুচি হয় না তার। একটার অনুসরণ করতে গিয়ে সে প্রাণ হারাতে বসেছিল; কিন্তু কেবল সেইজন্যেই না, এই কাঁকড়াগুলোই তো ঐ মৃত দেহটাকে এতদিন ধরে সমারোহে ও সপরিবারে আহার করছে…।

এইবার সে ফেরার মুখে পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়—দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে সুবাতাস বইতেও সুরু করেছিল,—এই বাতাসের অপেক্ষাতেই ছিল সে।

সাতাশ

মে লেথিয়েরি জনপ্রিয় ছিলেন তখনই যখন তাঁর টাকা ছিল। এখন কেউই আর তাঁর কথা বলে না। সাধারণ লোকের ধারণা মন্দভাগ্য হচ্ছে সংক্রামক, এইজন্য দুর্ভাগ্যপীড়িতদের ছায়া কেউ মাড়াতে চায় না, কি জানি, যদি দুঃসময়ের ছোঁয়াচ লাগে।

আজকাল খুব কমই কেউ হয়ত যায় লে-ব্রাভেয়। দেরুশার পাণিপ্রার্থীর ভিড় কমে গেছে। যেখানে যৌতুকের আশা নেই, তেমন গরীবের মেয়েকে কে বিয়ে করবে বলো?

সারা সেণ্ট্ স্যাম্পসন আজ সকাল থেকেই কলরবে মুখরিত। নতুন পাদ্রী রেভারেণ্ড্ এবিনেজার কড্রে হঠাৎ অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। তাঁর এক বড়লোক কাকা ছিলেন, তিনি মারা গেছেন লণ্ডনে,—ভাইপোকে সমস্ত উইল করে দিয়ে।

কাশমীয়ার জাহাজে এই খবর এসে পৌঁচেছে আজ সকালে। জাহাজ এখন নোঙর-লাগানো, অপেক্ষা করছে বন্দরে। কাল দুপুরেই সে আবার ছাড়বে—লণ্ডনের দিকে; সেই জাহাজেই এবিনেজার কড্রে রওনা হবেন ইংলণ্ডে, তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির দখল নিতে।

সেণ্ট্ স্যাম্পসনের কোন গৃহেই এই খবর পৌছতে আর বাকী নেই, কেবল মে লেথিয়েরির বাড়ি ছাড়া। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই এতক্ষণে জেনেছে এই সুখবর—শুধু লে-ব্রাভের বাসিন্দাদের কানে যায়নি।

মে লেথিয়েরিও আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছেন! অর্ধজাগরণে অর্ধ-স্বপ্নে অদ্ভুত অদ্ভুত পাখী তিনি দেখতে পান; নেপোলিয়ান এসে কথা কয় তাঁর সঙ্গে। এক একদিন সারা বিকালটা তিনি দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দেন—জানালার বাইরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। যেখানে পাথরের স্তম্ভের সঙ্গে আটকানো লোহার বালা রয়েছে তার দিকে চেয়ে—যে বালায় ডুরাঁদকে বেঁধে রাখা হোতো। লক্ষ্য করে করে তিনি দেখেন—মরচে পড়েছে সেই বালার গায়ে।

আটাশ

দিন সাতেক আগে লেথিয়েরি এক চিঠি পেয়েছিলেন—আজ সেই চিঠি পড়ে অবধি কিছু যেন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে। ভালো কি মন্দের দিকে, এখনো বলা যায় না—তবে যেন আকস্মিক একটা বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়ে তাঁর জড়ীভূত ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে।

সাতদিন আগে তাঁর পরিচারিকা ডাউস্ তাঁর হাতে এই চিঠিখানি দিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি তিনি খোলেনও নি—টেবিলের উপর রেখে দিয়েছিলেন যেমনকার তেমনি।

আজ সন্ধ্যায় ঘর ঝাঁট দেবার সময়ে, ডাউস্ প্রশ্ন করল—"বড্ড ধুলো জমেছে চিঠিটায়, ঝেড়ে দেব?"

মে লেথিয়েরির চমক্ ভাঙে—"ওঃ সেই চিঠি! দেখি!"

চিঠিখানা খুলে পড়তে সুরু করেন তিনি:

লিস্‌বনের ছাপ-মারা চিঠি।

মে লেথিয়েরির নিকট— **সমুদ্রবক্ষে ১০ই মার্চ**

সেণ্ট্ স্যাম্পসনে।

অনেকদিন পরে আমার খবর পেয়ে আপনি হয়ত খুশিই হবেন, আমি আশা করি। আমি এখন 'টাম্যালিপাস' জাহাজে—যাচ্ছি আমেরিকায়, আর

ফিরছি না ইউরোপে। গোয়ার্ণসির একজন নাবিক, আহারী টোটেভিন—ফিরবে এবং সমস্ত ঘটনাটাই আপনাকে বলবে। আমি লিস্‌বনযাত্রী এক জাহাজে এই চিঠিখানা তাকে দিলাম। আপনি হয়ত বিস্মিত হবেন জেনে যে, আমিও একজন খাঁটি লোক—সিউওর ক্লুব্যাঁর মতোই সাধু।

অবশ্য ইতিমধ্যে আপনি সমস্তই জেনেছেন, তবু পুনরুক্তি করায় বোধ হয় দোষ হবে না। কথাটা হচ্ছে এই যে, আমি আপনার কাছ থেকে না বলে যে টাকাটা ধার নিয়েছিলাম, তা সুদে-আসলে সমস্তই সিউওর ক্লুব্যাঁর হাতে গচ্ছিত দিয়েছি আপনাকে দিয়ে দেবার জন্য। তিনখানা ব্যাঙ্কনোটে, এক হাজার পাউণ্ডের প্রত্যেকটা—মোট ৭৫ হাজার ফ্রাঙ্ক ফেরত দিয়েছি।

সিউওর ক্লুব্যাঁ টাকা আদায়ের উৎসাহটা বড্ড বেশী দেখিয়েছিল—সেই জন্যই এই চিঠি লেখা সমীচীন মনে করলাম।

আপনার অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মচারী

র‍্যাতান

পুনশ্চঃ সিউওর ক্লুব্যাঁর হাতে রিভলবার ছিল, আমার রসিদ আদায় করতে না পারার এই হচ্ছে কারণ।

চিঠিটা শেষ করে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মে লেথিয়েরি জানালার বাইরে—সমুদ্রের দিকে চেয়ে। চিঠির মর্ম তিনি ভালো বুঝতে পারেন না। আস্তে আস্তে, তাঁর দৃষ্টির সামনে একটা স্বপ্ন-ছবি ভেসে ওঠে যেন।

দুর‍্যাঁদ আসছে। তেমনি ফানেল উঁচু করে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। এসে ভিড়েছে তাঁর বাড়ির ধারের সমুদ্র-কিনারায়। তার নোঙর বাঁধা হয়েছে সেই লোহার বালায়।

চম্‌কে ওঠেন লেথিয়েরি। ভালো করে চোখ রগ্‌ড়ে নেন। স্বপ্ন-না-সত্য? সত্যই তো? ঐ যে দুর‍্যাঁদের উঁচু ফানেল। তবে! ভালো করে দু'চোখ মেলে তাকান—ঐ যে, ঐ, ঐখানেই!

তিনি ছুটে বেরিয়ে পড়েন।

না—সত্যই। দুর‍্যাঁদের ইঞ্জিন—ভালো অবস্থাতেই আছে। চাঁদের আলোয় তিনি স্পষ্টই দেখতে পান। নৌকা দেখেও চিনতে পারেন—গিলিয়াটের মাছধরা বোটে। সেই দুঃসাহসী যুবক—যাকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন সেদিন রাত্রে—যদি সে দুর‍্যাঁদকে উদ্ধার করে আনতে পারে।

ইঞ্জিন, বয়লার, প্যাডেল, হুইল—সমস্তই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, একটা জাহাজ গড়ে তোলার জন্যে যা দরকার তার সব কলকব্জা, খুঁটিনাটি অংশও

নিয়ে এসেছে সে—কেবল কাঠামো ছাড়া। এমন কি ষ্টীমারের ঘণ্টাটিও বাদ যায়নি।

আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন মে লেথিয়েরি। ঘন ঘন সেই ঘণ্টা বাজাতে স্বরু করে দেন।

ঊনত্রিশ

গিলিয়াট যখন লে-ব্রাভেয় এসে তার নৌকা ভিড়িয়েছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। তার মুখে তখন চাপা-গলায় বনি-ডাণ্ডির স্বর।

ইঞ্জিন সমেত নৌকাকে নোঙর করে সে বাগানের মধ্যে দিয়ে যায় মে লেথিয়েরিকে খবর দিতে; এমন সময় সে বাগানের মধ্যে দেখতে পায়— তাকে।

কাকে—?

তার স্বপ্নের—তার জাগরণের—তার সমস্ত সাধনার—তার অসাধ্য-সাধনের—কুমারী দেরুশাকে। বাগানের মধ্যে একটা আসনে বসে দেরুশা।

গাছের মাথায় চাঁদের আলো পড়েছে,—সমুদ্র কি ভাষায় কথা বলছে কে জানে!

দেরুশা বিষণ্ণ মুখ হেঁট করে বসে আছে। তার শুভ্রবসন লুটোচ্ছে মাটিতে, সেদিকে তার হুঁস নেই। চাঁদের আলোয় কি ম্লানই না দেখাচ্ছে তার মুখ! তার হাত দুটো যেন মার্বেলের মূর্তির মতোই।

গিলিয়াটের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তার সারা দেহ কাঁপতে থাকে আনন্দে আর উত্তেজনায়।

মনে মনে বলে - "আমার—ও হচ্ছে আমার!

হঠাৎ ওদের দু'জনেই শুনতে পায় একটা শব্দ, যেন কে আসছে ঐ ধারেই—। গিলিয়াট দেরুশার ঠিক পেছনেই একটা ঝোপের আড়ালে লুকোয়।

যে লোকটা আসে, তাকে চিনতে পারে গিলিয়াট, যাকে সে একদিন সলিল-সমাধি থেকে বাঁচিয়েছিল, যে তাকে বাইবেল দিয়েছিল উপহার।—পাদ্রী এবিনেজার কড্রে।

কড্রে কুমারী দেরুশাকে তার অকস্মাৎ সৌভাগ্যলাভের কথা জানায়; কালই সে কাশমীয়ার জাহাজে চলে যাচ্ছে, বলে।

কুমারী দেরুশা চুপ করে থাকে। তার চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ গিলিয়াট যেন শুনতে পায়।

কড্রে বলে, তার গলার স্বর এবার মেয়েছেলের গলার চেয়েও কোমল ও মিষ্টি—"দেরুশা ! মিঃ লেথিয়েরি আমাকে কি তোমার স্বামী হবার অধিকার দেবেন ?"

দেরুশা শুধু চেয়ে থাকে তার দিকে।

কড্রে বলে চলে—"তুমি তো জানো, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি—কিন্তু এতদিন তুমি গির্জায় উপাসনায় গেছ, আমি একদিনও তা' ব্যক্ত করিনি। তার কারণ আমি তখন দরিদ্র ছিলাম, কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখতাম তোমায় ? কিন্তু আজ আমার কাকা তাঁর সবকিছুর মালিক করে গেছেন আমায় ; তাই তোমার পাণিপ্রার্থনার আজ আমার সাহস হয়েছে—"

দেরুশা নতমুখে বলে—"কি বলব আমি ? আমার কাকাকে বলুন।"

"সে তো তাঁকে বলবই,—আগে তোমার আমি উত্তর চাই।"

"ভগবান শুনেছেন আমার উত্তর।" এইটুকুই শুধু বলে দেরুশা।

ত্রিশ

এবিনেজার কড্রে এগিয়ে আসে, বলে, "তা'হলে ভগবানই আমাদের ভালোবাসার সাক্ষী থাকুন।"

দেরুশা উঠে দাঁড়ায়।

গিলিয়াট দু'টি ছায়ামূর্তিকে দেখতে পায়।

এই সময় মহা কলরবে ঘণ্টা বাজতে সুরু করে।

মে লেথিয়েরি ঘণ্টা থামান, যখন তিনি দেখেন একজন লোক ছুটে যাচ্ছে তাঁর বাগানের পাশ দিয়ে। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরেন।

তারপর তাকে টেনে নিয়ে চলেন তাঁর বাড়ির উঠানে। তাঁর আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর বাধা পায় দুঃখ ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে ! থেমে থেমে তিনি বলতে থাকেন—

'আমার সোনার ছেলে ! দেখেই আমি বুঝেছি যে তুমিই। বলো সমস্ত আমায়—এ যে ভোজবাজী ! একটা ইস্ক্রুপ, পর্যন্ত হারায় নি—সমস্তই আছে, আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, চাকাগুলো বোধ হয় আছে ঐ সিন্দুক দুটোয় ? তোমাকে নৌকায় দেখতে না পেয়ে ঘণ্টা বাজাতে আরম্ভ করি, জানি যে, শুনতে পেলেই তুমি আসবে তুমি দেবদূত, আমার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছ ! আমার ইঞ্জিন ! এ স্বপ্ন নয়তো ? বলো, আমি পাগল হয়ে যাইনি—সত্যই ?'

তারপর তিনি ক্লুব্যার কথা বলেন, যা এ পর্যন্ত জানতে পারা গেছে তার সম্বন্ধে। আহা, ঐ টাকাটা যদি পেতেন, তা'হলে আবার ষ্টীমার তৈরি

করে তুলতে দেরি হতো না তাঁর। কিন্তু টাকাটা মেরে নিয়ে উধাও হয়েছে সেই বিশ্বাসঘাতকটা—!

গিলিয়াট, নীরবে, তার কোমর থেকে বেল্ট্‌টাকে খুলে টেবিলের উপর রাখে। তারপর সেই লোহার ডিবে খুলে তিনখানা ব্যাঙ্ক-নোট তুলে দেয় মে লেথিয়েরির হাতে। গিনিগুলোও।

নোটগুলো পরীক্ষা করে লেথিয়েরি লাফিয়ে ওঠেন আনন্দে।—"য়ঁ্যা! আমার নোটও? তুমি কি যাদুকর! এ যে ক্লুব্যাঁরই বেল্ট্‌—এই যে তার নামও খোদাই করা! অসাধ্য-সাধন করেছ তুমি। এতদিনে আবার আমার স্বপ্ন সফল হোল!"

গিলিয়াট চুপ করে থাকে—সমুদ্রের ধারে অটল শান্ত পাহাড়ের মতো। ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস যেন তাকে বিচলিত করতে পারে না।

মে লেথিয়েরি বলেন—"আহা! তোমার কথা আমি ভুলে যাচ্ছি কিন্তু তা' কি ভুলতে পারি? অবশ্যই দেরুশার সঙ্গে তোমার আমি বিয়ে দেব।"

গিলিয়াট গলা নামিয়ে জবাব দেয়—স্পষ্ট সুরে—"না।"

"না?" লেথিয়েরি চম্‌কে ওঠেন—"সে কি! কি বলছ তুমি?"

গিলিয়াট বলে—"আমি ভালোবাসি না ওকে।"

"ভালোবাসো না ওকে?" লেথিয়েরি অবাক হয়ে যান—"তবে জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই অসাধ্য-সাধন করতে গেলে কেন? সে কি আমার জন্যে?"

গিলিয়াট চুপ করে থাকে।

একত্রিশ

ইতিমধ্যে একদল লোক, গোলমাল শুনে জড় হয় বাড়ির উঠানে। ডাউস্‌ আর গ্রেস্‌ আলো নিয়ে আসে। মে লেথিয়েরি জোরগলায় সুসংবাদ শুনিয়ে দেন সবার কাছে।

গিলিয়াট সম্বন্ধে উচ্চতম প্রশংসা করেও নিজের উচ্ছ্বাস তিনি প্রকাশ করতে পারেন না—"ও হচ্ছে সমুদ্রের সিংহ! সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের রাজা! ওর পাশে, নাবিকরা কেউই দাঁড়াতে পারি না। দেরুশাকে আমি ওকেই দেব।"

এই সময় দেরুশা আস্তে আস্তে এসে ঢোকে সেখানে। চুপটি করে বসে তার কাকার পেছনের এক চেয়ারে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আর একজন লোক। সুন্দর তার চেহারা আর গায়ে কালো কোট।

সে আসা মাত্র, জনতা সসম্ভ্রমে পথ করে দেয় তার জন্য।—পাদ্রী এবিনেজার কড্রে!

তিনি এসে নিঃশব্দে দাঁড়ান। তাঁর চোখ মিলিত হয় দেরুশার দৃষ্টির সঙ্গে।

মে লেথিয়েরি ঘুরে দাঁড়ান। ভাইঝিকে দেখতে পান। দেরুশাকে কাছে টেনে চুমু খেয়ে বলেন—"ঐ হচ্ছে গিলিয়াট। যদি হয়ে ওঠে, কালই ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

তারপর পাদ্রীর দিকে তাঁর চোখ পড়ে।

—"এই যে মিষ্টার কড্রে! আপনি ওদের বিবাহে পৌরোহিত্য করবেন। আপনাকেই দিতে হবে ওদের বিয়ে। আমার আর সময় কই? আমাকে উঠে-পড়ে লাগতে হবে জাহাজ গড়ার কাজে। মিস্ত্রি-মজুর ডাকিয়ে কাল থেকেই।"

তারপর গিলিয়াটকে তিনি টেনে আনেন আলোর সামনে—"কি সুন্দর এ দেখতে! যেন স্বর্গের দেবদূত!"

কিন্তু গিলিয়াটের চেহারা তখন যতদূর সম্ভব বিশ্রী আর বীভৎস দেখাচ্ছিল! যে অবস্থায় সে সামুদ্রিক পর্বতমালা ছেড়ে এসেছে সে তখন সেই অবস্থাতেই। ছেঁড়া আর ময়লা পোশাক, মুখময় দাড়ি, মাথাভরা জটপাকানো ঝাঁকড়া চুল। চোখ লাল, মুখ রোগা আর বিবর্ণ, হাত রক্তাক্ত, ছেঁড়া জামা-কাপড়ের ফাঁক দিয়ে প্রকাশিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর অক্টোপাসের আঙুলের ছাপ।

"চমৎকার। এমন সুন্দর হয় না!" লেথিয়েরি চীৎকার করে ওঠেন।

ডাউস্ আর গ্রেস্ দৌড়ে যায় দেরুশার কাছে। সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে তখন।

বত্রিশ

পরদিন ভোর হতে-না-হতেই সারা সেণ্ট্ স্যাম্পসন জুড়ে কী হৈ-চৈ! আশপাশের চারধার থেকে লোক এসে জুটতে লাগল। ডুরাঁদের পুনরুদ্ধার—সে এক অসম্ভব কীর্তি! তাই দেখবার জন্যই লোকের ভীড়।

কিন্তু মে লেথিয়েরি কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছিলেন না ইঞ্জিনের কাছে। দু'জন নাবিক তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন পাহারায়—তারা কাউকে এগোতে দিচ্ছিল না সেদিকে। তারা দূর থেকে তাকাচ্ছিল আর বলাবলি করছিল—"যাই বলো বাপু, এমন অমানুষিক লোক থাকা ভাল নয় কিন্তু আমাদের দ্বীপে! যাদের কাছে কিছুই অসাধ্য নয়! তারা কি সাংঘাতিক!"

বাইরে থেকে দেখা যায় ড্রইং রুমে যে লেথিয়েরি টেবিলের সামনে বসে কি লিখছেন। লিখতে লিখতে তিনি পরিচারিকাদের ডাকেন—"ডাউস্!—গ্রেস্!"

ডাউস্ আসে।

"দেরুশা কি করছে?"

"ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেছে বাইরে।"

"সেটা ভালো।" লেথিয়েরি বলেন। "ভোরের হাওয়া ওর উপকার করবে। কাল রাত্রে ঘরের মধ্যে গরমে, লোকজনের ভীড়ে আর দুরাঁদ ফিরে পাওয়ার উত্তেজনায় মূর্ছা গেছল বেচারা। যা হোক—চমৎকার বর হবে ওর।"

এই পর্যন্ত বলা হলে, তিনি আবার লেখা সুরু করেন। বলেন—"দাঁড়াও এক মিনিট।"

চিঠিটা লেখা শেষ হলে চার ভাঁজ করে—ওর ওপর নাম-ধাম না লিখেই এবং খামে না এঁটেই উনি দেন ডাউসের হাতে—"এই চিঠিখানা দাওগে গিলিয়াটকে।"

পরিচারিকা একটু অবাক হয়ে তাকায়।

"জাহাজ মেরামতের কাজে আমি ব্যস্ত থাকব কিনা! আমার বেরুবার সময় কই? নিজেই বা দেখাশুনা করি কখন! মিস্ত্রি ডাকতে পাঠিয়েছি—কাঠামো তৈরি করতে লোকজন সব লাগাতে হবে এখনি। তাই লিখে দিলুম গিলিয়াটকে।"

ডাউস্ কৌতূহলী হয়।

"লিখে দিলুম সে যেন নিজেই দেরুশার সব ভার নেয়। পাদ্রীর কাছে গিয়ে বিয়ে করে আসে—আমার সম্পূর্ণ সম্মতি রইল। যদি আজই হয় তাই হোক, আমার আপত্তি নেই। এই কথাই লিখে দিলুম। যাও, তুমি চিঠিখানা দিয়ে এস গিলিয়াটকে।"

"বুভ্যলারুতে গিয়ে দিয়ে আসবো?"

"হ্যাঁ, ওর বাড়িতে বুভ্যালারুয়ে।"

তেত্রিশ

দশটা বাজতে তখন আর বেশী দেরি নেই। সমুদ্রের ধারে অদূরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাশমীয়ার জাহাজ—নোঙর ফেলা।

কাশমীয়ার ছাড়বে বারোটার পরে; কিন্তু এখনো তার পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সমুদ্রের ধারেই একটা ঝোপের আড়ালের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল এবিনেজার কড়ে আর দেরুশা।

ছু'জনে ছু'জনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। ছু'জনের মুখই বিষণ্ণতায় ভরা।

দেরুশা বলছিল—"তুমি যেও না এখান থেকে।"

"তোমার কাকা কি বললেন শুনলে তো।"

"হ্যাঁ।"

"তা'হলে আমি আর কি করতে পারি বলো!" এবিনেজার বলেন—"এখান থেকে আমার যাওয়াই উচিত নয় কি?"

"তুমি গেলে আমি মারা যাব!" দেরুশা বলে আস্তে আস্তে। "তুমি চলে গেলে তখন কী হবে আমার? আমার বুক ভেঙে গেছে।"

এবিনেজার চুপ করে থাকেন।

দাঁড় ফেলার ঝপাঝপ শব্দ শোনা যায়। কাশমীয়ার থেকে একটা নৌকা এগিয়ে আসছে এই দিকেই। এবিনেজারকে নেবার জন্যই, বোধ হয়।

"না, না!" দেরুশা চেঁচিয়ে ওঠে। "যেয়ো না তুমি।"

এবিনেজার বলেন—"না, আমাকে যেতেই হবে।"

"না! আমার কাকা তো নির্দয় নন—আমাকে তিনি খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু সামান্য একটা ইঞ্জিনের জন্য! সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে দেখেছিলে তুমি কাল রাত্রে? কী বীভৎস দেখতে! তুমি ছেড়ে যেও না আমাকে। এখানে থাকো—একটা না একটা উপায় বের করতে পারবেই ক'দিনে।"

দেরুশা এবিনেজারের হাত চেপে ধরে ছু'হাতে।

চৌত্রিশ

নরম আঙুলের বেষ্টন থেকে এবিনেজার আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নেন। আইভি ছাওয়া একটা পাথরের উপর দেরুশা বসে পড়ে অসহায়ের মতো—তার বড়ো বড়ো চোখে অদ্ভুত এক আলো—ডুবন্ত মানুষের চোখে যে আলো জ্বলে সেই আলো তার চোখে।

নৌকা এসে ভিড়েছে সমুদ্রের তীরে।

এবিনেজার ছু'হাতে দেরুশার হতাশা-ভরা মুখখানি তুলে ধরেন। সম্ভ্রমের সঙ্গে স্পর্শ করেন তার কেশগুচ্ছ। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকেন তার দিকে। তারপর একটি চুমু দেন তার ললাটে। বলেন—"তা'হলে বিদায় দেরুশা!"

দেরুশা ভেঙে পড়ে অশ্রুর উচ্ছ্বাসে।

এই সময় কে একজন বলে ওঠে খুব কাছ থেকেই—তার গলার স্বর ধীর আর গম্ভীর।—"তোমরা বিয়ে করো না কেন?"

তারা মুখ ফিরিয়ে গিলিয়াটকে দেখতে পায়। আজকে তার আর কালকের মতো চেহারা নেই। চুল-ছাঁটা হয়েছে; দাড়ি-কামানো সুন্দর মুখ; গায়ে শাদা ঝকঝকে সার্ট—নাবিকদের মতো তার কলার-ওলটানো। পরনে নাবিকের পোশাক।

দেরুশা ও এবিনেজার অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

গিলিয়াট বলে—"বিদায়ের কথা বলছ কেন? বিয়ে করে একসঙ্গেই তো যেতে পারো তোমরা ঐ জাহাজেই।"

দেরুশার আপাদমস্তক ভাবাবেগে কাঁপতে থাকে—"আমার কাকা"—এর বেশী সে বলতে পারে না।

গিলিয়াট বলে—"তোমরা যদি ওঁর অনুমতি চাইতে যাও তা'হলে হয়ত পাবে না। কিন্তু বিয়ে চুকে গেলে তখন তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তাছাড়া"—তার গলার স্বর যেন হঠাৎ কেঁপে ওঠে—"তাছাড়া এখন ত তিনি নতুন ষ্টীমার নিয়েই ব্যস্ত।"

"আমি কারো দুঃখের কারণ হতে পারব না," দেরুশা বলে আস্তে আস্তে। "কারু মনে কষ্ট দিতে পারব না আমি।"

"দুঃখ আর কতদিন!" গিলিয়াট বলে—"সবচেয়ে বড় দুঃখও মানুষ ভুলে যায়।"

গিলিয়াটের কথার ভাব এবিনেজার ও দেরুশার বুঝতে দেরি হয় না।

গিলিয়াট বলে—"তা'হলে আর দেরি নয়। কাশমীয়ার ছাড়তে আর মোটে দু'ঘণ্টা বাকি, এর মধ্যেই গির্জায় গিয়ে সব সেরে ফেলতে হবে।"

এবিনেজার এবার ভালো করে চেয়ে দেখে গিলিয়াটের দিকে।

"আমি চিনতে পেরেছি তোমাকে। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে।"

"আমি তা' মনে করি না!"

"যেদিন আমি এখানে এসে পৌছলাম।"

"কেবল সময় নষ্ট হচ্ছে!"

"কাল রাত্রেও তোমাকে আমি দেখেছি। তুমি সেই অদ্ভুত নাবিক!"

"সম্ভবতঃ।"

গিলিয়াট নৌকার দাঁড়ীদের ডেকে বলে—"একটু অপেক্ষা কর তোমরা আমরা আসছি এখনি।"

পঁয়ত্রিশ

বিয়ে সেরে গির্জা থেকে যখন বেরুল তারা, তখন কাশমীয়ার জাহাজে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

গিলিয়াট বলে—"ঠিক সময়েই তোমরা পৌচেছ।"

সমস্ত রাস্তাটা, গির্জা থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত, এবিনেজার আর দেরুশা, হাতের মধ্যে হাত দিয়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত হেঁটে এসেছে। গিলিয়াট এসেছে তাদের পিছনে পিছনে।

এবিনেজার গিয়ে নৌকায় ওঠে। দেরুশা উঠতে যাচ্ছে, এমন সময়ে গিলিয়াট তার পোশাক স্পর্শ করে।

দেরুশা ফিরে দাঁড়ায়।

গিলিয়াট বলে—"তুমি তো সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রস্তুত ছিলে না। জাহাজে পোশাক-পরিচ্ছদের অভাব হতে পারে তোমার"—

এই বলে গিলিয়াট থামে। দেরুশা চুপ করে থাকে।

"কাশমীয়ারে আমি একটা বড় বাক্স পাঠিয়ে দিয়েছি। তা'তে নববধূর পরবার মত সমস্ত পোশাক তুমি পাবে। আমার মা আমাকে দিয়েছিলেন আমার বৌ-এর জন্যে, যদি কখন আমি বিয়ে করি। তোমাকে তা' উপহার দেবার অধিকার আমাকে দাও।"

"কেন, তোমার বৌ-এর জন্যে তা' রেখে দাও না?" দেরুশা বলে।

গিলিয়াট জবাব দেয়—"আমি কখনো বিয়ে করব আমার মনে হয় না।"

"সে কি ভালো? তুমি এমন সুন্দর!"

—"ধন্যবাদ!" দেরুশা ও গিলিয়াট দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে অপলকদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে।

তারপর, গিলিয়াট দেরুশাকে বোটের উপর তুলে দেয়। পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাদের নৌকা গিয়ে কাশমীয়ার জাহাজের গায়ে লাগে।

জাহাজও ছেড়ে দেয় তার একটু পরেই।

ছত্রিশ

গিলিয়াট তাড়াতাড়ি চলে। সেণ্ট্‌ স্যাম্পসনের গলি-ঘুঁজি দিয়ে জনতাকে এড়িয়ে। সব লোকের মুখে কেবল তারই কথা, সবাই তাকে খুঁজছে—কিন্তু সে খোঁজে কাকে?

নিজের বাড়ি যায় সে, একটা জানালা খুলে দেয়, কাশমীয়ার তার বাড়ির ধারে এসে পৌছতে কত দেরি।

টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা বাইবেল। এবিনেজার যা তাকে দিয়েছিলেন। আর দেয়ালের গায়ে ঝুলছে তার ব্যাগ্‌পাইপ।

বাড়ির দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। চাবি রাখে কোটের পকেটে।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় সেই প্রাকৃতিক পার্বত্য চেয়ারটির কাছে, যে আসনের সলিল-সমাধি থেকে সে একদিন উদ্ধার করেছিল এবিনেজার কন্তেকে।

সেই চেয়ারটিতে গিয়ে বসে সে।

তখন জোয়ার এসেছে সমুদ্রে; জল ক্রমশঃই ফেঁপে উঠছে। চেয়ারের তলাটা জলমগ্ন হয়ে গেছে।

কাশমীয়ার তখন, সমস্ত দ্বীপটা প্রদক্ষিণ করে সেই ধার দিয়েই আসছে। সে তাকিয়ে থাকে সেই জাহাজের দিকে।

এখন জাহাজটা যাচ্ছে তার খুব ধার দিয়ে। ডেকের ওপরে সে দেখতে পায় দু'টি অস্পষ্ট মূর্তিকে পরস্পর কাছাকাছি। এবিনেজার দেরুশার হাত ধ'রে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে, তন্ময় হয়ে গল্প করছে তারা দু'জনে।

পাশ দিয়ে যাবার সময়ে, গিলিয়াটের যেন কানে আসে—দেরুশার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি!—"দেখো দেখো! মনে হচ্ছে যেন, কে বসে আছে ঐ পাহাড়টার গায়ে।"

তারপর জাহাজ চলে যায়।

পনেরো মিনিট পরে দিগ্বলয়রেখার কাছে শুধু একটুখানি ভাঙা ঢেউয়ের চিহ্ন। পিছনে শুভ্র চক্ররেখায় জাহাজ চলে যায় দূরে প্রায় দৃষ্টির আড়ালে।

সেই শুভ্র রেখাই বা আর কতক্ষণ? কতক্ষণই বা আর ঐ উন্নত মাস্তুল।

জোয়ারের জল এসে তখন তার কোমর পর্যন্ত পৌঁচেছে। তখনো, তবুও, সে চেয়ে থাকে সেই অনন্ত জলরাশির বুকে—অস্তমিত জাহাজের দিকে।

জল ওঠে—আরো,—আরো।

সে চেয়ে আছে তখনো।

জাহাজের চিহ্নরেখাও যখন মিলিয়ে যায়, সমুদ্রের ঢেউ তখন ছাপিয়ে উঠেছে। স্পন্দনহীন গিলিয়াট তখনো বসে আছে।

বিখ্যাত ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত 'টয়লার্স অব্‌ দি সী' উপন্যাস হইতে এই গ্রন্থ অনূদিত। হুগো ১৮০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে। লে মিজারেবেল, ক্রমওয়েল, নত্রো ডাম ডি প্যারিস প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে বিখ্যাত।

গল্প

ফকিরের অভিশাপ

আলোচনা সভা-গৃহের ভিতর থেকে দরজার ধাক্কাধাক্কি ও চীৎকার শুনে বাইরে থেকে লোকজন ছুটে এলো।

'খুলে দাও, খুলে দাও শীগগির···এমনভাবে বাইরে থেকে চাবী বন্ধ করলে কে?' আমেরিকার ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের সহকারী (attache) লিণ্ডন জনসনের উত্তেজিত চীৎকার ভিতর থেকে বাইরে ফেটে পড়ছে। দূতাবাসের লোকজন তক্ষনি ছুটোছুটি করে ঘরের চাবী এনে ঘর খোলার ব্যবস্থা করলে। কিন্তু একি, ঘরের চাবী যে খোলাই যাচ্ছে না! নানাভাবে সবাই চেষ্টা করলে বহুক্ষণ ধরে; তারপর কোন কিছুতেই যখন কিছু হল না তখন ঘরের দরজা ভেঙে বার করতে হল ভদ্রলোককে।

কয়েক বছর পূর্বে করাচীর আমেরিকান দূতাবাসে ভাইস-প্রেসিডেণ্টের আগমন কালে ঘটনাটি ঘটে।

আশ্চর্য ঘটনা। আশ্চর্যজনক আরো এইজন্যে যে, ভিক্টোরিয়া রোডের এই প্রাসাদতুল্য হাল-ফ্যাসানের শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত বাড়ি, যার মাত্র এক বছর পূর্বেই দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে, যেখানকার নতুন দরজা-জানালায় আধুনিক কলকব্জার ব্যবস্থায় কোথাও একটুকু খুঁত নেই, সেখানেই ঘটে গেল এই অঘটন!

সামান্য অকিঞ্চিৎকর হলেও এমন অস্বস্তিকর ঘটনা, এমন অঘটন মানুষের

জীবনে ঘটে না যে তা নয়, ঘটেও থাকে সময় সময়, কিন্তু তাদের সঠিক কোন সূত্রই আবিষ্কার করা যায় না অনেক সময়।

কিন্তু এখানেই এই ঘটনার সূত্র ধরে স্থানীয় অনেক লোকজন চলে গিয়েছিল অনেক দূর—অনেক পুরনো দিনের স্মৃতি তুলে ধরে, এর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল তারা।

যেখানে এই বিরাট আমেরিকান দূতাবাসটি গড়ে উঠেছিল সে রাস্তাটি হচ্ছে করাচীর সবচেয়ে সৌখিন রাস্তা—ভিক্টোরিয়া রোড। এই রাস্তার উপরেই খানিকটা জমি ১৯২৫ সাল থেকে খালিই পড়েছিল। এই জমির আশপাশে নানা ক্লাব, রেস্তরাঁ, দোকান প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু ঐ ফাঁকা জায়গাটুকুর সদ্ব্যবহার করার জন্য কারুর কোন উৎসাহ দেখা যায় নি।

এক সময় আমেরিকানরা করাচীতে একটি নতুন দূতাবাস নির্মাণ করার প্রয়োজন বোধ করে এই পরিত্যক্ত জায়গাটি ক্রয় করে। শহরের যারা পুরনো অধিবাসী তারা এই ব্যাপারটির মধ্যে একটি অশুভ লক্ষণ কল্পনা করে মোটেই খুশি হতে পারে নি—কারণ, তাদের জমিটি ছিল শতবর্ষের অভিশাপে অভিশপ্ত—এবং সত্যসত্যই প্রেতাশ্রিত। এ সম্বন্ধে এত কাহিনী তারা জানে এবং তাদের প্রত্যেকটি কাহিনী যে প্রমাণসিদ্ধ—এটাও তারা বিশ্বাস করে। কত মানুষ যে এই অভিশপ্ত জমির উপর প্রাণ হারিয়েছে তার প্রমাণের অভাব নেই।

এই অভিশপ্ত কবরের কাহিনী সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় 'ডিউ এণ্ড মিল ডিউ' নামক একখানি গ্রন্থের সাহায্যে। এই গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন পারসিভ্যাল খ্রীস্টোফার রেন। ইনি বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে করাচীর স্কুল-ইনস্পেক্টার ছিলেন।

তাঁর মতে একজন মুসলমান পীরকে এই জমির নীচে কবর দেওয়া হয় এবং একজন ফকির ঐ কবরের রক্ষণাবেক্ষণ করত। একদিন ঐ ফকির জানতে পারলো যে, সোরাবজী রোস্তমজী পওয়ালা নামে একজন ব্যবসাদার এই জমির মালিক হয়ে তার উপর এক বিরাট বাংলো গড়ে তোলার আয়োজন করছে। এই সংবাদ শোনা মাত্রেই ফকির তাকে এই কাজ করতে নিষেধ করে এবং যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, এর দ্বারা পীরের কবর কলুষিত হবে। কিন্তু ধনবান পওয়ালা ফকিরের শত উপরোধ-অনুরোধকে মোটে আমল দেয় না।

কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ক্রোধে উন্মত্ত ফকির সোরাবজী রোস্তমজীকে অভিশাপ দিয়ে বলে যে, 'তার বংশের যে যেখানে

আছে তারা সবাই এবং বাংলোয় যে বা যারাই বাস করবে, তাদেরই শোচনীয়ভাবে জীবনান্ত ঘটবে! এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই কথাগুলি বলেই উত্তেজিত ফকিরের জীবনান্ত ঘটে সেই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে।

ব্যবসায়ী রোস্তমজী কিন্তু এতে এতটুকুও বিচলিত হয় না। সে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কবরের উপর তার স্বপ্ন-সৌধ নির্মাণ করতে আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল অচিরেই ফলতে শুরু করে।

বাড়ির ভিত্‌ খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মরণের অভিযান আরম্ভ হয় একজন মজুরকে দিয়ে। বাড়ির ভিতের গর্তে কাজ করতে করতে একটি গোখ্‌রো সাপের কামড়ে মারা যায় ঐ মজুরটি। তারপরই ভাড়া থেকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে আর একজন কুলির।

অতঃপর উপর্যুপরি মৃত্যুর মহড়া চলতে থাকে। বাড়ির চৌকিদারের ছেলে ফুটন্ত পীচের কড়া থেকে পীচ ঢালতে গিয়ে প্রাণ হারায় এবং একজন প্রহরীর মাথায় ভারা থেকে ইঁট পড়ে মাথাটা দু-ফাঁক হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটে।

এইভাবে উপর্যুপরি কয়েকজনের মৃত্যু ঘটলেও বাড়ি তৈরির কাজ কিন্তু চলতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বাড়িটি একদিন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপর কিন্তু ফকিরের অভিশাপ সরাসরি রোস্তমজী ও তার পরিবারবর্গের উপর গিয়ে অর্সায়।

তখন তারা সকলেই ঐ বাড়িতে বসবাস করছে। গৃহপ্রবেশ হয়েছে মাত্র কিছুদিন হল। একদিন সন্ধ্যাবেলা অকস্মাৎ সামান্য ব্যাপারে সমস্ত পরিবারের বুকে নেমে আসে এক দুর্যোগের বিভীষিকা। ছোট্ট ভাইপোকে বাঁচাতে গিয়ে তার সঙ্গে রোস্তমজীর নিজেরও ইহলীলার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ ধরনের মৃত্যু যেমন বিস্ময়কর তেমনি দুঃখে। ঘটনাটির ঘটে এইভাবেঃ বাড়ির সিঁড়ির রেলিং-এর উপর উঠে রোস্তমজীর ফুটফুটে ছোট্ট ভাইপোটি খেলা করছে দেখে তিনি তার পড়ে যাবার ভয়ে নেমে পড়ার জন্য চেঁচিয়ে ওঠেন। হঠাৎ এই চীৎকারে ছেলেটি টাল সামলাতে না পেরে চমকে ওঠে এবং রোস্তমজী নিজে ছুটে তাকে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে উঁচু দোতলার সিঁড়ি থেকে নীচে ছেলেটির উপর পড়ায় ছেলেটিও মারা যায় এবং নিজেরও দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

এখানেই এই ধারাবাহিক মৃত্যুর শেষ যবনিকাপাত হয় না। এই প্রেতপুরীর মালিক রোস্তমজীর অপঘাত মৃত্যুর পর স্বভাবতই বাড়ির মালিকানা

গিয়ে অর্সায় তার পুত্র দোয়াবজীর উপর। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসের ফলেই হোক বা ফকিরের মৃত আত্মার অভিশাপেই হোক দোয়াবজীকেও এই বাড়ি বেশীদিন ভোগ করতে হয়নি। অল্পদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে রক্তদুষ্টির ফলে। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু-একটা গুরুতর কারণের ফলে সংঘটিত হয়নি। সামান্য একটি জানালা খুলতে গিয়ে একটা মরচে-ধরা পেরেকে তার হাতের একটি জায়গা সামান্য কেটে গিয়েছিল মাত্র।

এই কাটা থেকেই রক্ত দূষিত হয় এবং নানা চেষ্টা করেও দোয়াবজীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এর চেয়েও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে তখনও বাকি ছিল এবং সেটা সমাপ্ত হয় রোস্তমজীর এক পৌত্রের মৃত্যুতে। উপর্যুপরি এতগুলি নিকট আত্মীয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু চোখের সামনে ঘটে যেতে দেখে রোস্তমজীর ঐ পৌত্র তোরমানজী এমনই স্নায়ুদৌর্বল্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এবং এইখানেই রোস্তমজী পরিবারের বিয়োগান্ত নাটকের এক প্রকার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরে এ বাড়ির ভাড়াটে হয়ে আসে একজন ইংরেজ ও তার স্ত্রী—মিঃ ও মিসেস্ রীল্ড। পাঁচটি সপ্তাহ এ বাড়িতে কাটাতে না কাটাতে সাহেবের হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যায় এবং একদিন একটা ক্ষুরের সাহায্যে সে তার স্ত্রীর গলা কেটে ফেলে নিজে আত্মহত্যা করে। সে এক বীভৎস উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা! এই ঘটনা অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

এই সকল ঘটনাও অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায় পরের ভাড়াটিয়েদের ভয়াবহ ঘটনার কাছে। এবং যার জন্য বাড়িটার নামই হয়ে গিয়েছিল 'আকস্মিক মৃত্যু আবাস।'

মিঃ ও মিসেস্ রীল্ডের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই চারজন বৃটিশ নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মচারী এই সকল মৃত্যু বিভীষিকা বা পীর ফকিরের অভিশাপের কাহিনীকে নিছক কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে এই বাংলোতে থাকার জন্য আসে। তাদের মধ্যে একজন একদিন স্বপ্ন দেখে যে, এক ফকির চারটি উন্মুক্ত কবরের পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে—'ক্ষিতি আর মরুৎ, অগ্নি আর অপ।' তখনও তারা এটা বিশ্বাসই করতে চায়নি যে, একজনের অভিশাপ আর একজনের উপর ফলতে পারে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তারা চারজনে ফকিরের ওই একই স্বপ্ন দেখে পরপর।

এর পর আরম্ভ হল ওই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-এর অলৌকিক কাজ।

কেবলমাত্র অলৌকিকই নয়, চারজন সামরিক কর্মচারীর কি ভয়াবহভাবে জীবনান্ত ঘটলো এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-এর মধ্যে সেই কাহিনীই এবার বর্ণনা করি : এক ধূসর কুয়াসাচ্ছন্ন প্রাতঃকালে যে কর্মচারী প্রথম স্বপ্ন দেখেছিল, সে হঠাৎ নিখোঁজ হল। পরে জানা গেল, সে একটা গভীর খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল—এবং সেখানে নতুন একটা 'প্যারেড গ্রাউণ্ড' তৈরীর ব্যাপারে যে সব মজুররা কাজ করছিল, তারা ভুলক্রমে তাকে সেই মাটির মধ্যেই জীবন্ত কবরস্থ করে। অতএব এ ব্যাপারে এটাই প্রমাণ হল যে, ক্ষিতির শিকার হল প্রথম জন।

দ্বিতীয় শিকার হল মরুতের। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি বিলেতে ফিরে গিয়ে বিমান-চালকের কাজ নেয় এবং মোনোপ্লেন দুর্ঘটনায় সে-ই প্রথম বিমান-চালকদের মধ্যে প্রাণ হারায়। এরপর তৃতীয় ব্যক্তির কথা। এই তৃতীয় শিকার হল অগ্নির। কি কারণে সঠিক জানা যায় না, করাচীতেই একটি গ্রাম্য কুঁড়ের মধ্যে সেই সাহেব ঢুকেছিল এক রাতে এবং সেখানে একটি কেরোসিনের আলো উল্টে আগুন ধরে যাওয়ায় সাহেবের মৃত্যু ঘটে।

চতুর্থ ব্যক্তি স্বপ্নের এই সত্য পরিণতির কথা চিন্তা করে একেবারে বিস্ময়াবিভূত হয়ে গিয়েছিল এবং যত রকমে সম্ভব জলের কাছ থেকে নিজেকে সকল সময়েই দূরে রাখার চেষ্টা করেছিল। সাঁতার কাটা, স্নান করা প্রভৃতি জলের সংস্পর্শে আসার ব্যাপার সে একেবারেই ত্যাগ করেছিল বলতে গেলে। এমন কি পানীয় জল পর্যন্ত সে গরম না করে পান করত না। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও ফকিরের অভিশাপের হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পায় নি। একদিন হঠাৎ একটা পুরনো ধরনের মারবেল-গুলি আঁটা সোডার জলের বোতল ফেটে গিয়ে তার গুলি ছিট্‌কে রগে লাগে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়।

এর পরও আরো বহু বছর ধরে বহু লোকই এই 'আকস্মিক মৃত্যু আবাস'-এর সংস্পর্শে এসে প্রাণ হারিয়েছে। শেষে এমন হয় যে, আর কেউ এর মধ্যে এসে বসবাস করতে সাহস করেনি—ফলে বহু বছর বাড়িটা পরিত্যক্তই ছিল। এবং বহুদিন মেরামত না হওয়ায় বাড়িটা একরকম ভেঙেই গিয়েছিল। শেষে ১৯২৫ সালে এটাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে ফেলা হয়।

তারপর থেকে জমিটা খালিই পড়েছিল যতদিন না আমেরিকানরা এটা কেনে। সেটা হল ১৯৫৫ সালের ঘটনা। যদিও আমেরিকানরা এই অভিশাপের কাহিনীকে মেয়েলী গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু যে স্থপতি

এই দূতাবাসটির নক্সা রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি অতটা অবিশ্বাসী হতে সাহস পান নি। এঁর নাম রিচার্ড জে, নিউট্রা। মিঃ নিউট্রা ভিয়েনার লোক। তিনি স্থানীয় মুসলমান প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি উপায়ে পীরের উপক্রুত আত্মার প্রীতিসাধন করা যায় তার পরামর্শ গ্রহণ করেন।

১৯৫৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্‌কেন্দর মির্জা কর্তৃক এই দূতাবাসটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। সরকারী ভাবে অনুষ্ঠিত কোন আমেরিকান অনুষ্ঠানে এই প্রথম দু'জন পুরোহিত শ্রেণীর ব্যক্তি—একজন মুসলমান, আর একজন খৃস্টান—গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মঞ্চোপরে উপবেশন করেছিলেন। তাঁদের বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল এই কারণে যে, প্রস্তরটি গ্রথিত হওয়ার পূর্বে তাঁরা মঙ্গলাচরণ দ্বারা জমিটিকে পবিত্র করবেন।

প্রয়োজনীয় এই সকল ঘটনার পর, তিন বছরব্যাপী ভবনটির নির্মাণ কার্যের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। সামান্য কয়েকজন মজুরের কিছু আঘাত লেগেছিল আর একজন মজুর বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল—বৃহৎ গৃহনির্মাণ ব্যাপারে এরকম সামান্য সামান্য ঘটনা ঘটেই থাকে—সেটা এমন কিছু ছিল না।

স্থপতি নিউট্রা কিন্তু দূতাবাসটির নক্সা রচনায় এমন একটি সতর্কতা গ্রহণ করেছিলেন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যা করেছিলেন তা হচ্ছে পীরের কবরটি বাদ দিয়ে তার চারপাশে দূতাবাসটিকে গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া ভবনটিকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য সম্মুখভাগে খানিকটা জমি খালি রেখে দিয়েছিলেন। আর একটি স্বল্পপরিসর কৃত্রিম হ্রদও তৈরী করা হয়েছিল বাড়িটির সন্নিকটেই।

১৯৫৭ সালের সেই বিরাট হর্ম্য আজও করাচীতে দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু দূতাবাসটি আজ আর সেখানে নেই—সেটি চলে গিয়েছে রাজধানী বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডিতে। তবে এখনও এই বাড়িটিতে ফকিরের সেই অভিশাপ কি ফলপ্রসূ? এই পুরাতন দূতাবাসটি কি প্রেতাশ্রিত?

করাচীর লোকেরা কিন্তু এখনও এই পুরাতন দূতাবাসটি কি প্রেতাশ্রিত?

করাচীর লোকেরা কিন্তু এখনও এই পুরাতন দূতাবাস থেকে একরকম অপার্থিব শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা বলে। আবার কেউ কেউ বলে তারা প্রেতাত্মাদের খালি বারান্দাতে ঘুরে বেড়াতেও দেখেছে। এর উপর সেদিনের

আমেরিকান কর্মচারীর আলোচনা সভা-গৃহের অর্গলবদ্ধ হওয়ার ঘটনা তো প্রত্যক্ষ।

কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিশাপ যা আমেরিকানদের ভোগ করতে হল তা হচ্ছে—এই দূতাবাসটির আর কোন সার্থকতা রইল না, কারণ এটি তৈরী হবার সময়েই পাকিস্তান সরকার তাঁদের রাজধানী করাচী থেকে রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করেন।

অতএব ভিক্টোরিয়া রোডের উপর অবস্থিত এমন চিত্তাকর্ষক ভবনটি এখন কন্‌সিউলেট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে গড়ে উঠেছে এক নতুন দূতাবাস।

'অভিশাপ' হয়ত এখনও তার ভয়াবহ কোন কাজ দেখাতে পারে বলে সকলেরই একটা আতঙ্ক আছে ওই জায়গা সম্পর্কে, ওই বাড়ি সম্পর্কে এবং ওই বাড়ির লোকজন সম্পর্কে।

তিন বন্ধুর কাহিনী

তিন বন্ধু ছিল - অমল, কমল আর বিমল। অমল ছিল খুব মোটা—এত মোটা মানুষ কেউ কখনও চোখে দেখেনি। কমল ছিল তেমনি রোগা। মানুষ যে তালপাতার সেপাই-এর মত রোগা হতে পারে, এ কথা কেউ ভাবতে পারে না! আর অমল ছিল মাঝারি ধরনের—বেশ মাপসই চেহারা।

তিন বন্ধুতে খুব ভাব। সারাদিন একসঙ্গে বেড়ান, গল্প করা, খাওয়া-দাওয়া সবই তারা একসঙ্গে করত—কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারত না। আজ পর্যন্ত কখনও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। এক দণ্ড কেউ আলদা থাকলে অপর দু'জনের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। কেবল রাত্রিবেলা যে-যার বাড়িতে শুতে যেত—ছাড়াছাড়ি যা হ'ত তা কেবল সেই সময়েই।

তিনজনেই অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে, কাজেই কোন কিছুর অভাব তাদের ভোগ করতে হ'ত না।

দিনগুলি বেশ সুখেই মনের আনন্দে কাটছিল তাদের। একদিন বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটল।

তারা মাঝে মাঝে এক-একদিন তিনজনে মিলে শিকার করতে বেরুত। এমনি একদিন তিনজনে শিকার করতে বেরিয়েছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় তারা একটি পুরনো মন্দির দেখতে পেল। গাছপালায় ঢাকা এই মন্দিরটার মধ্যে কি আছে দেখবার জন্যে হঠাৎ

তাদের মাথায় খেয়াল চাপল। তিন বন্ধুতে মিলে তখুনি জঙ্গল পরিষ্কার করতে লেগে গেল!

সূর্য যখন ডুবু-ডুবু তখন জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা দেখল, ভিতর থেকে মন্দিরের দরজাটা বন্ধ। তখন তাদের মনে হল, হয় মন্দিরের মধ্যে কেউ আছে, অথবা অনেক দিন না খোলাখুলির জন্যে দরজাটা ভীষণ শক্ত হয়ে গেছে।

অনেক ঠেলাঠেলির পর দরজাটা খুলে গেল। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত পা-পা করে এগুতে আরম্ভ করেছে। দরজাটা খুলে যেতেই তারা অবাক হয়ে দেখলে, মন্দিরের মধ্যে কি যেন দুটো আলোর ভাঁটার মত জ্বলছে।

এখানে আলো কোথা থেকে এলো এই কথা ভেবে তারা মন্দিরের ভেতরে ঢুকে এগিয়ে চললো। একটু কাছাকাছি যেতেই বোঝা গেল ওটা আলো নয়, মানুষেরই দুটি চোখ, আলোর মত দেখাচ্ছিল দূর থেকে।

একটু লক্ষ্য করতেই তিনজনে দেখল, একজন লোলচর্ম অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্থিরনেত্রে চেয়ে বসে আছেন। ওরা তাঁর আরও কাছে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় তিনি হাতের ইঙ্গিতে ওদের বসতে বললেন।

রাত্রি কাটাবার মত আশ্রয় পেয়ে ওরা খুবই খুশী হ'ল। তিন বন্ধুতে তখন পা টিপে-টিপে এক কোণে গিয়ে বসল।

এমনি ভাবে চুপটি করে তিনজনে বসে বসে প্রায় এক প্রহর হয়ে গেল। তিনি কোন কথাও বলেন না, আর ওরাও সাহস ক'রে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা!

সারাদিন শিকারের পিছনে ছুটোছুটি ক'রে ওদের তখন ক্ষিদেও পেয়েছে যেমন, ঘুমও পেয়েছে তেমনি। ক্রমশঃ ঘুমে তাদের চোখ জড়িয়ে এলো—শেষে এক সময় তারা তিনজনেই সেইখানে মাটির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সারারাত কোথা দিয়ে কিভাবে যে কেটে গেল কেউই জানে না। হঠাৎ ভোরের দিকে মন্ত্র পাঠের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। অমল দেখল, সন্ন্যাসী ঠাকুর পদ্মাসন করে বসে মন্ত্রপাঠ করছেন। অমল তার আর দুই বন্ধুকে জাগালো।

তিনজনে উঠে বসার পর হঠাৎ তাদের ইচ্ছে হ'ল এই রকম একজন

সাধক সন্ন্যাসীকে যখন পাওয়া গেল, তখন তাঁর কাছ থেকে কিছু-না-কিছু আদায় করতে হবে!

এই ভেবে তিনজনেই তারা সন্ন্যাসীর সামনে হাঁটু গেড়ে জোড় হাত করে বসল।

সন্ন্যাসীর মন্ত্রপাঠ শেষ হলে, তিনি চোখ চেয়ে তাদের তিনজনকে এই অবস্থায় দেখে খুশী হলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের তিনটি বর দিচ্ছি, তোমরা এই তিনটি বরে তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি যে কোন পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে একবারের জন্য যা মনে করবে, তাই হবে।

অন্তর্যামী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে খুশী মনে, এবার তারা বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হ'ল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা পুকুরের ধার দিয়ে যাবার সময় সন্ন্যাসীর বরের কথা তাদের মনে হ'ল। তখন সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে অমল বললে, আমি ভাবছি, ডুব দিয়ে বর চাইব, আমি যেন রোগা হয়ে যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে বললে, আমি ডুব দিয়েই একমনে বলব, আমি যেন মোটা হয়ে যাই।

অমল ও কমল দু'জনে তখন বিমলকে বললে, আমরা তো এই বর চাইব, কিন্তু তুমি কি বর চাইবে, বিমল?

বিমল মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলে, আগে তোমাদের হোক দেখি, তারপর আমি যা হোক একটা বেছে নেবো।

অতঃপর প্রথমেই অমল পুকুরে নামল। ডুব দিয়েই একমনে সে বললে, আমি যেন রোগা হয়ে যাই!

জল থেকে উঠে আসতে-আসতেই দেখা গেল, সত্যিই অমল খুব রোগা হয়ে গেছে। এত রোগা যে তাকে চেনাই যায় না!

তারপর ডুব দিল কমল। সেও একমনে বললে, আমি যেন মোটা হয়ে যাই।

ডুব দিয়ে উঠে আসতেই দেখা গেল, সন্ন্যাসীর বর কমলের বেলাতেও ফলেছে সত্যি হয়ে—বেশ মোটা হয়ে গেছে কমল। এত মোটা যে কমল বলে চেনাই যায় না!

অমল ও কমল এরপর বার বার বিমলকে বললে, তুমিও এবার যাও ভাই; একটি বর চেয়ে নাও।

কিন্তু বিমল রাজি হ'ল না। সে বললে, এত দামী বরটা এখুনি চেয়ে নেব না, একটু ভেবে-চিন্তে চাইব।—একটাই তো বর, নিলেই ফুরিয়ে যাবে!

যাই হোক তারা তিনজনে এইবার বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

একটা তেমাথা রাস্তার মোড়ে এসে অমল গেল পূবে, কমল উত্তরে আর বিমল পশ্চিমে।

অমল তাদের বাড়ির সদর দরজার কাছে যেতেই দরওয়ান তাকে পথ আটকে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল—কাকে চাই?

অমল বললে, আরে আমি অমল—ভিতরে যাব।

কিন্তু দ্বারী কিছুতেই শুনতে চায়না তার কথা, বরং সে অমলের উপর তম্বি-তম্বা আরম্ভ করলে। গেটের কাছে এই গোলমাল শুনে অমলের মা, বাবা ও বাড়ির আর সবাই একে একে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

অমল নিজের পরিচয় দিতেই তারা সকলে হেসেই খুন। বললেন, তুমি কেমন করে অমল হবে, অমল আমাদের খুব মোটাসোটা—আর তুমি তো একেবারে রোগা ডিগডিগে!

কিছুতেই তাঁরা আর অমলকে বাড়ি ঢুকতে দিলেন না।

কমলেরও ওদিকে একই অবস্থা। সেও বাড়িতে প্রবেশাধিকার পেল না চেহারা বদলে যাওয়ার জন্যে। তারও বাবা-মা বললেন, তুমি কেমন করে কমল হবে বাছা—কমল আমাদের খুবই রোগা, আর তুমি তো হাতীর মত মোটাসোটা ধুম্‌সো!

মনের দুঃখে তারা দু'জনেই ফিরে গেল। গিয়ে, সেই পুকুরের পাড়ে বসে দু'জনে অনেক পরামর্শ করল, শেষে ঠিক করল বিমলের সঙ্গে দেখা করবে।

বিমলের বাড়িতে গিয়ে অমল আর কমল উপস্থিত হতেই বিমল খুব অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, কিরে তোরা এখনো দু'জনে বাড়ি যাসনি?

অমল কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, কি করব বল ভাই, আমাদের দু'জনের কারুকেই বাড়ি ঢুকতে দিলে না, এমন কি বাবা-মা চিনতে পারলেন না—এখন এ বিপদ থেকে কি করে বাঁচি তাই বলো?

বিমল একটু ভেবে নিয়ে বললে, কি ভাগ্যি আমি আমার বরটা খরচ করে ফেলিনি—করলে কি বিপদ হ'ত বল তো? চল্, এবার আমার বরটা কাজে লাগাই। এই কথা বলে, ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে তিন

বন্ধু আবার সেই পুকুরের পাড়ে গেল। তারপর বিমল পুকুরে ডুব দিয়ে একমনে বললে—আমার দুই বন্ধু আগে যেমন ছিল আবার যেন তেমনি হয়ে যায়।

সন্ন্যাসীর বরের গুণে দেখতে দেখতে আবার অমল রোগা থেকে মোটা হয়ে গেল, আর কমল মোটা থেকে হয়ে গেল আগের মত রোগা।

তিন বন্ধু তখন পরস্পরে মনের সুখে গলা-জড়াজড়ি করে বাড়ি ফিরে গিয়ে, আগের মত আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

এমনও ঘটে

দিদির মাথার শিয়রে বসেছিলেন অক্ষয়কুমার। অসুস্থ দিদি, দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন, বয়সও হয়েছে অনেক, তার উপর ভুগে ভুগে বিছানার সঙ্গে যেন একেবারে মিশে গেছেন। আজ দু'দিন হ'ল জলগ্রহণ পর্যন্ত করছেন না। বেশ বোঝা যাচ্ছে আস্তে আস্তে জীবন-প্রদীপ নিবে আসছে তাঁর।

মাথার শিয়রে বসে মায়ের মত এই দিদির কথাই ভাবছিলেন অক্ষয়কুমার, আর দেখছিলেন মৃত্যুর কালিমায় ছায়াম্লান মুখখানির দিকে। এতদিন সমস্ত সংসারটাকে মাথায় করে ছিলেন এই দিদিই। তাঁর বাহুপুটের আড়ালে সংসারে যা-কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা সব ঢেকে রেখেছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসেন দিদি। চলে আসেন, অন্য কোন কারণে নয়—একমাত্র সন্তান নয়নের মণি দশ বছরের ছেলেকে হারিয়ে। অসুখের সময় ডাক্তার পর্যন্ত ডাকেনি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন ডাক্তার ডাকতে। কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। সেই থেকেই শ্বশুরবাড়ি ছাড়া দিদি। অনেক বিষয়-সম্পত্তি থেকেও তিনি আর সে মুখো হননি—কোন সম্পর্কই রাখেননি শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে।

টপ টপ ক'রে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল অক্ষয়কুমারের চোখ থেকে। পড়বি তো পড় একেবারে দিদির মুখের উপর। চমকে উঠে চোখ চাইলেন দিদি। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কিরে কাঁদছিস্?'

দিদির এই কথায় আরও যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন অক্ষয়কুমার। এক রকম কাঁদতে-কাঁদতেই বললেন 'দিদি, একবার তুমি অনুমতি দাও

ডাক্তার দেখাবার। আমাদের শেষ সান্ত্বনার জন্যেও অন্ততঃ একবার বলো। আজ কবিরাজমশাই তো বলেই গেলেন: এখন আপনারা এ্যালোপাথিক করাতে পারেন।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে নিজের জন্যে জীবনে কখনো ডাক্তার ডাকেনি দিদি। বাড়িতে ডাক্তার ডাকার কথা হলেও চটে যেতেন। এ ব্যাপারে দিদির অসম্মতি যে কেন তা সকলেই জানত। ত্রিশ বছর আগে ডাক্তার দেখাবার অভাবে ছেলে মারা যাওয়ায় ডাক্তারের উপরেই তাঁর যেন একটা বিরাগ জন্মে গিয়েছিল।

চোখের জল মুছছেন অক্ষয়কুমার এমন সময় হঠাৎ দিদির কথা শুনে বিস্মিত হয়ে উঠলেন। এ কি দিদির কথা—না অন্য কেউ কথা বলছে, জ্বর বেশী হওয়ায় বিকারের ঘোরে নিজের সঙ্গেই যেন নিজে কথা বলছেন তিনি। চোখ বোজা অথচ কথা ব'লে চলেছেন। তাঁর মুখের কাছে কানটা এগিয়ে নিয়ে গেলেন অক্ষয়কুমার। দিদি বলছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাক্তারই দেখা অক্ষয়, আমার সেই ডাক্তার ছেলেকে নিয়ে আয় রে······সে এলেই সব সেরে যাবে।······মস্ত ডাক্তার হয়েছে খোকা আমার।······

নির্ঘাত বিকারের ঘোর। তবু মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় তোমার ডাক্তার ছেলে দিদি?

চোখ বোজা অবস্থাতেই জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিলেন দিদি। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর বললেন স্পষ্ট। তারপর একটু থেমে টেনে টেনে আবার বললেন, সময় বেশী নেই রে, যা এক্ষুণি যা······

কি মনে করে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই উঠে পড়লেন অক্ষয়কুমার। চাদরটা কাঁধে ফেলে চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দিদি যে রাস্তার কথা বলেছিলেন সেই রাস্তায় গিয়ে ঢুকলেন। রাস্তাটি তাঁদের বাড়ি থেকে খুব বেশী দূর ছিল না, কিন্তু সে রাস্তায় কোন ডাক্তার থাকে বলে মনে করতেই পারলেন না অক্ষয়কুমার। রাস্তায় ঢুকে নম্বর খুঁজে বার করলেন।

একখানা দোতলা মাঝারি ধরনের বাড়ি। নীচে একটি লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কোন ডাক্তার থাকেন কি?

উত্তরে লোকটি বললে, হ্যাঁ, উপরে উঠে যান।

পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন অক্ষয়কুমার। গিয়ে দেখলেন একটি

দরজার গায়ে ডাক্তারের নাম লেখা 'ডোর-প্লেট'। দরজার কাছে গিয়ে ডাকতেই একজন চাকর বেরিয়ে এসে বললে, 'আপনি কাকে চান?'

অক্ষয়কুমার ডাক্তারবাবুর কথা বলতেই সে তাঁকে ঘরে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল।

একটি চেয়ারে বসে অক্ষয়কুমার কি ক'রে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ডাক্তারের কাছে কথা পাড়বেন তাই ভাবছেন, এমন সময় তার চিন্তায় বাধা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন ডাক্তারবাবু। ত্রিশ-একত্রিশ বছর বয়স, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ চেহারা, প্রতিভার দীপ্তিতে চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। অক্ষয়কুমারকে দেখেই ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'বলুন কি প্রয়োজন আপনার?'

অক্ষয়কুমার ডাক্তারের চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, একটি অত্যন্ত রহস্যজনক ঘটনার সূত্র ধরে আপনার সন্ধান পেয়েছি, উপস্থিত আপনি যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়ি যান তা'হলে বিশেষ উপকৃত হব।

ডাক্তারবাবু মুখে মৃদু হাসির রেশ টেনে বললেন, 'সমস্ত ঘটনাটা আমায় যদি না খুলে বলেন, তাহলে কি করে বুঝব বলুন?'...

তখন অক্ষয়কুমার যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে তাঁর দিদির ব্যাপারটা খুলে বললেন ডাক্তারের কাছে। সব বলা শেষ করে অক্ষয়বাবু ডাক্তারকে আবার বললেন, আপনি কি দয়া করে এখুনি যাবেন একবার!

—'নিশ্চয়ই যাব। মা'র এমন অসুখ, মা ডেকেছেন আর আমি যাব না, তা কি হয়! আপনি একটু বসুন, আমি ব্যাগটা নিয়ে আসছি।

দু'জনেই তাঁরা একসঙ্গে এসে ঢুকলেন রোগীর ঘরে। ডাক্তার প্রথমেই রোগীর নাড়ীতে হাত দিয়ে বললেন, মা, আমি এসেছি—দেখ তো চেয়ে।

ডাক্তার হাত ধরতেই অক্ষয়বাবুর দিদি হঠাৎ যেন চোখ মেলে চাইলেন। তারপর নিজের হাতটা আস্তে আস্তে তুলে ডাক্তারের মুখে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁপা গলায় বললেন, বাবা তুই এসেছিস্, এবার আমি নিশ্চিত ভাল হয়ে উঠব।...কই মুখটা তোর দেখি একবার। আর বেশী কথা বলতে পারলেন না তিনি। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল তাঁর, ডাক্তারও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন এই ধরনের ঘটনায়।

সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে ডাক্তারের চিকিৎসায় ভাল হয়ে উঠলেন অক্ষয়কুমারের দিদি।

তারপর অনেক দিন বেঁচেছিলেন তিনি। কিন্তু যতদিন বেঁচেছিলেন ডাক্তারবাবুও তাঁকে মা বলে ডাকতেন আর ঐ বৃদ্ধাও তাঁকে ভালবাসতেন নিজের ছেলের মত। মুখে বলতেন, এই তাঁর সেই মৃত সন্তান।

ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। এই ডাক্তার ও অক্ষয়কুমার যে কে ছিলেন তা শুনলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। এই ডাক্তার হলেন বিখ্যাত স্যার নীলরতন সরকার। তখন তিনি সবেমাত্র মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছেন। আর অক্ষয়কুমার হচ্ছেন বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন লেখক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্র।

এই কাহিনী সম্বন্ধে পরে অক্ষয়কুমারের দিদিকে যখনই কেউ প্রশ্ন করত যে আপনি কি করে ঐ রাস্তার নাম ও বাড়ির নাম দিলেন? উত্তরে দিদি বলতেন, তা আমার কিছুই মনে নেই।*

---

* এই কাহিনী ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের জামাতা 'প্রবাসী'-সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শোনা।
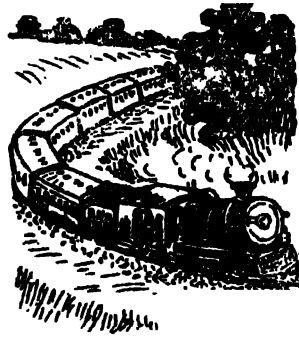
বড়লাটের বড় মন

ইংরেজরা অনেক দিন আমাদের দেশে রাজত্ব করে গেছে। শাসক হিসাবে তারা যে অত্যাচারই করুক, মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে এক একজন রাজকর্মচারী এমন সব ঘটনার নিদর্শন রেখে গেছেন যা স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। তাঁরা সম্মানীর সম্মান করতেন, গুণীর কদর জানতেন আর কারু ধর্মবোধকে কখনো ক্ষুণ্ণ করতেন না।

এমনি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা আজ এখানে তোমাদের কাছে বলব. ঘটনাটি ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের কিছু আগে। সর্বভারতীয় শিক্ষার এক ব্যাপার নিয়ে ভারতে ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে বিলেতের টনক নড়ে এবং সেখান থেকে বড়লাটের উপর নির্দেশ আসে যে, মধ্যস্থ হিসাবে ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এর একটা ফয়সাল করে ফেলতে।

ভারত শাসনের জন্য ইংলণ্ডের রাজ-প্রতিনিধি হিসাবে বড়লাটরাই ছিলেন তখন এদেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ভারতে বিশেষ রকমের কোন গণ্ডগোল বাধলে বা প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে, এই বড়লাটদেরই জবাবদিহি করতে হত ইংলণ্ডের রাজার কাছে এবং প্রয়োজনে সেখানকার নির্দেশ মতই চলতে হত।

তখন ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন। বিলাতের নির্দেশ মত তিনি এলাহাবাদে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়কে নিয়ে এক বিচার-সভার আয়োজন করেন। কলকাতা থেকে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি মনোনয়ন করেন। কলকাতা থেকে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি মনোনয়ন করেন এবং স্থির হয় তাঁকে নিয়ে একসঙ্গে লর্ড কার্জন কলকাতা থেকে এলাহাবাদ রওনা হবেন। প্রথমদিকে বড়লাটের সঙ্গে একই গাড়ীতে যেতে

স্যার গুরুদাস আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত লর্ড কার্জনের কথায় তাকে রাজী হতে হয়।

স্যার গুরুদাস ছিলেন অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। পূজা-অর্চা ও খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব বেশী বাচ-বিচার ছিল তাঁর। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের হাতে ছাড়া তিনি কখনো কোথাও খেতেন না এবং স্নান-আহ্নিক সেরে তবে জলস্পর্শ করতেন।

এলাহাবাদে যাবার দিন আগে থেকে স্থির হয়ে থাকলেও গাড়া কবে ছাড়বে তা স্যার গুরুদাস জানতেন না। মাত্র আগের দিন তাঁর কাছে খবর এল যে, গাড়ী আগামীকাল সকালের দিকে ছাড়বে। সময়টা অবশ্য সেই সঙ্গে সঠিক বলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ সাত সকালেই দুপুরের খাওয়া সেরে বেরুনো তো আর সম্ভব নয়। তাই স্যার গুরুদাস প্রাতঃকৃত্য সেরে সামান্য কিছু জলযোগ করেই যাত্রা করলেন।

বড়লাট বাহাদুরের তখন সম্পূর্ণ আলাদা ট্রেন থাকত। ঝকঝকে তকতকে সেই ট্রেনের মধ্যেই থাকত তাঁর ও তাঁর লোকজনের থাকা-খাওয়া ও কাজকর্ম করার ব্যবস্থা। সে ট্রেন বড়লাটের গন্তব্যস্থান ছাড়া আর কোথাও থামত না। তার জন্যে অন্য সব ট্রেনকে পাশে সরিয়ে রাস্তা করে দিতে হত। লর্ড কার্জনের কামরার পাশেই স্যার গুরুদাসের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কামরার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল।

যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে গেল। যে যাঁর কামরায় গিয়ে তাঁরা গুছিয়ে বসলেন। ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ট্রেন ছুটতে লাগল ভাইসরয় ও স্যার গুরুদাসকে নিয়ে। বড় বড় স্টেশন সট্‌সট্ করে চক্ষের নিমেষে পেরিয়ে যেতে লাগল, কোথাও কোন জংশনেও থামবার প্রয়োজন নেই কয়লা জল নেবার জন্যে।

সকাল পেরিয়ে দুপুরের রোদ সোজাসুজি মাথার উপরে উঠল। খাওয়া-দাওয়ার সময় হল বড়লাট লর্ড কার্জনের। বাড়ির মত গাড়ীর মধ্যেই সব সুব্যবস্থা। স্নানাদি সেরে তিনি পরিপাটিভাবে লঞ্চ খেলেন। বেলা তখন প্রায় দেড়টা। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করবেন এমন সময় লর্ড কার্জন কি একটা পরামর্শ করার জন্য ডেকে পাঠালেন স্যার গুরুদাসকে।

এক কামরা থেকে অপর কামরায় যাবার জন্য মধ্যে দরজার ব্যবস্থা ছিল আর গাড়ীতেই। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী গিয়ে পাশের কামরায় খবর দিতেই স্যার গুরুদাস উঠে এলেন।

দুজনের কথাবার্তা আরম্ভ হবে, এমন সময় হঠাৎ বড়লাটের কি মনে হল তিনি স্যার গুরুদাসকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার মধ্যাহ্ন-ভোজন হয়েছে তো?"

"না, আমি একেবারে এলাহাবাদে গিয়ে খাব।"—উত্তরে বললেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"সে কি কথা! আপনি সারাটা দিন উপবাসী থাকবেন?"—বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন লর্ড কার্জন।

"আমার খাবার অনেক হাঙ্গামা। গাড়ীতে সে সব হবার উপায় নেই। তাছাড়া—"

সব শুনলেন লর্ড কার্জন। তারপর বললেন, "এখন অন্য কথাবার্তা থাক আগে আপনি পরের স্টেশনে নেবে খাওয়া-দাওয়া সারুন, তারপর আলাপ আলোচনা হবে।" এই কথা বলেই তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে পরের স্টেশনেই গাড়ী থামাবার নির্দেশ দিলেন এবং সেই সঙ্গে বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের খাবার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যাতে হয় তা দেখতে বললেন।

গুরুদাস পথে এ সব হাঙ্গামা করায় যদিও আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে লর্ড কার্জন মোটেই কর্ণপাত করেন নি।

বিহারের শেষ সীমান্তে একটি সামান্য ছোট স্টেশনে এসে বড়লাটের ট্রেন থেমে গেল। স্টেশনের স্টেশনমাস্টার থেকে ছোট বড় সমস্ত রেল কর্মচারীরা থরহরি কম্পমান, সারা অঞ্চল জুড়ে হৈ চৈ ছুটোছুটি পড়ে গেল। গাড়ী থেকে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও লোকজন সব নেবে পড়ল। স্টেশনমাস্টার বিহারী ভদ্রলোককে জানান হল ব্যাপারটা এবং তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্যে জোর দিয়ে বলা হল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই স্টেশনের কাছে একটি বাগানবাড়ীতে স্যার গুরুদাসের স্নান ও আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন স্থানীয় স্টেশনের লোকজনেরা। নতুন উনুন তৈরী হল, নতুন হাঁড়ি কলসী, আনাজ-কোনাজ মসলাপাতি ঘি তেল নুন এল এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় একজন উঁচুদরের পশ্চিমী ব্রাহ্মণ এসে নতুন হাঁড়িতে সরু আতপ চালের ভাত চড়িয়ে দিলে। কুশাসনে বসে *খাঁটি গব্যঘৃত সহযোগে পদ্মপাতায় ভাত ও নিরামিষ তরকারি বাঁড়ুজ্যে* মশাই আহার করলেন। আহারের পূর্বে ইঁদারার জলে তিনি ভালভাবে যে স্নান করে নিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

প্রায় . ঘণ্টা দুই সময় লেগে গেল এই সব ব্যাপারে। লর্ড কার্জন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় নিজে থেকে স্টেশনে নেবে তদারক করলেন। এই সময় টুকুর মধ্যে অসংখ্য লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। বড়লাটের এই ট্রেন বড়লাটকে দেখতে তো বটেই তবে তাঁর সঙ্গে যে বাঙ্গালী জজকে খাওয়াবা জন্য বড়লাট গাড়ী থামিয়েছিলেন, তাঁকে দেখবার কৌতূহল ছিল তাদের মধ্যে বেশী।

এই ঘটনা নিয়ে সারা রেল লাইনে সেদিন হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল রেলে কর্মচারীদের মধ্যে এবং কয়েকখানি ট্রেন পথে বিভিন্ন স্টেশনে প্রায় ঘণ্টা দুই আটক পড়েছিল, বড়লাটের ট্রেন এলাহাবাদে না পৌঁছানো পর্যন্ত।
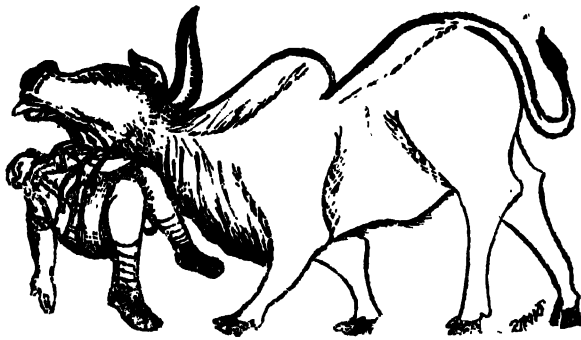
পাঁড়েতে-ষাঁড়েতে

ষাঁড় বলতে হ্যাঁ, বড়বাজারের ষাঁড়! যেমন দশাসই চেহারা, তেমনি গাঁজখাই ডাক! হয়ত তাদের জন্ম পশ্চিমে, হয়ত তারা পাটনাই বা ভাগলপুরী, কিন্তু দীর্ঘ দিন বাংলার পুঁয়েপাওয়া মাটিতে, এই ঘিঞ্জি কলকাতার এঁদো গলিতে, রোদে-জলে ভিজে-পুড়েও ত' গতরে ঘুন ধরেনি, এতটুকু টসকায়নি! বরং খোদার খাশির মত কেঁদো হয়ে দিন দিন ফলেই চলেছে সব! কাছ দিয়ে গেল ত, যেন একেবারে চলন্ত হিমালয় গেল গা ঘেঁষে তার ওপর আবার গা-ঝাড়া বা শিং-নাড়া দিলে ত' আর রক্ষে নেই—একেবারে বাপ, বাপ, বলে, কাছায়-কোঁচায় জড়িয়ে বেসামাল!

পথ চলতে এক এক সময় ভারী বিরক্তিকর! শুধু কি এই পথ চলা পথিকদেরই—দস্তুরমত ভাড়া দিয়ে, দোকান ক'রে বসে আছে যারা দু' পয়সা রোজগারের চেষ্টায় তাদেরও। আর ফুটপাথের বেসাতিদের ত' কথাই নেই! একবার একটু অন্যমনস্ক হয়েছ ত' ব্যাস্,—একসঙ্গে চারটে কমলার অন্তর্ধান, দুটো ডালিম গালের মধ্যে পিষ্ট হচ্ছে, এক থোকা আঙুর উধাও! ঝোড়াসুদ্ধ ফুলকপি হয়ত শিঙের গুঁতোয় রাস্তায় গড়িয়ে গেল, হাঁ হাঁ করতে করতে বাঁধাকপির আধখানা চক্ষের নিমেষে হয়ে গেল নিঃশেষ। মারধোর কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, একেবারে নির্লজ্জ বেহায়ার দল! এই তাড়িয়ে দিলে, ঘুরতে-ফিরতে গদাইলস্করি চালে আবার তোমার দোকানেরই পাশে এসে ঘুরঘুর করছে। এমনি চুরি-চামারি, লুট-তরাজ ক'রে যেখানে সেখানে খেয়েই ত' এই গতর! আর আমাদের গেঁয়ো ক্ষীণজীবী বোকা ষাঁড়গুলো মাঠের ওপর মরছে শুধু শুকনো ঘাস চিবিয়ে!

তারপর শুধু কি এই; বর্ষার মাথা গোঁজবার জন্যে যেই একটু বারান্দার

তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অমনি হেলতে-দুলতে ভিজে উবসুটি হ'য়ে তিনিও এলেন্ আশ্রয় নিতে—এক কাঠা জায়গা নিয়ে, হাজারখানেক মাছি সমেত। অসহ্য বলে অসহ্য! এর ওপর আছে ত' আবার যেখানে সেখানে রাস্তাঘাটে বিশ্রী রকমের নোংরাম—গরু আর বলেছে কেন তবে!

কটন স্ট্রীটের মাঝ বরাবর আমার মেওয়ার দোকান। এই মাত্র আমার সামনে রাস্তার মধ্যে যে কাণ্ড ঘটে গেল, তারই প্রতিক্রিয়ার মনে মনে আবার আমি এইসব কথাই ভাবছিলাম। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভাবতে আমাকে হয়েছে অনেকবারই, কিন্তু বিহিত আমি এর কিছুই করতে পারিনি।

সাধারণতঃ এ রাস্তার আশপাশে পরিচিত যণ্ডেশ্বর 'গুণ্ডা'। আমরা দোকানদাররা ও এ-পাড়ার সকলে মিলে ওর নাম দিয়েছিলাম গুণ্ডা। গুণ্ডা আমাদের গলির মধ্যে ঢুকলেই সকলে তাকে তাড়া করত ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ছড়ি লাঠি উঁচিয়ে দোকানের গায়ে ঘেঁষতে দিত না। সে কিন্তু এর মধ্যেই অতর্কিতে বেপরোয়া হয়ে, কারুর দোকানের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে এটা-ওটা তুলে নিত, আবার কখনও বা মার খেয়ে, মুখ ঘুরিয়ে হেলতে দুলতে চলে যেত অন্য দিকে। গুণ্ডা ছাড়াও, এ-গলির মধ্যে গুণ্ডার সাঙ্গ-পাঙ্গ আরও অনেককে দেখা যেত বটে, কিন্তু তারা গুণ্ডার মত মারাত্মক ও বেপরোয়া ছিল না।

কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম পুলিশের যেন এদিকে একটু নজর পড়েছে। মধ্যে মধ্যে শহরের এখানে-ওখানে ছাড়া গরুদের তাড়া ক'রে প্রায়ই দৌড়ঝাঁপ করছে তারা। গাই, বাছুর, বলদ, ষাঁড় কিছুই বাদ যাচ্ছে না। কোমর বেঁধে লাঠি-সোটা নিয়ে ডন্-বৈঠক দিতে দিতে তাদের সামলে-সুমলে নিয়ে যাওয়াও কম কষ্টের ব্যাপার নয়! কোন একটা বজ্জাত হয়ত দজ্জাল চালে লাফাতে আরম্ভ করল, কোনটা বা শিঙ বাঁকিয়ে কোন গলির মোড়ে এসে মারে এক ছুট—পুলিশের চোখ ক'রে হিন্দী ভাষায় একটা অশ্লীল উক্তি করতে করতে খৈনি পুরলে গালের মধ্যে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জিজ্ঞাসা করলে বলতঃ ফটকে বা খোঁয়াড়ে।

দুষ্ট গরুদের জন্যে খোঁয়াড় আছে জানতাম, কিন্তু কলকাতায় বহুকাল ধরে এই ধরনের বৃষকুলের অত্যাচারের কোন বিহিত হ'তে না দেখে ভাবতাম, এখানে বোধহয় এ-নিয়মের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই প্রথম প্রথম পুলিশের ঐ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন আশান্বিত হয়েছিলাম, তেমনি অপরদিকে, আমাদের এ-পাড়ায় গুণ্ডার অপ্রতিহত ঘোরাফেরা অবদমিত হ'তে না দেখে

মনটা আবার দমে গিয়েছিল। গুণ্ডাকে সায়েস্তা করতে না পারলে আর হ'ল কি!

মধ্যে মধ্যে এও ভাবতাম, হয়ত গুণ্ডাকে এ-কলে ফেলা সম্ভব হয়নি বা কলে পড়েও প্যাঁচ মেরে সে পয়াকার দিয়েছে।

আমাদের এ তল্লাটে গুণ্ডা বেশ একটা আলোচনার বিষয় হয়ে পড়েছিল—তার নামের চেয়ে আচরণের জন্যই আরো বেশী ক'রে। মারাত্মক, গোঁয়ার, একরোখা, নির্লজ্জ এই গুণ্ডা! একবার আমরা সকলে মিলে ঠিক করলাম, গুণ্ডাকে বেদম প্রহার দিয়ে হয় পাড়া ছাড়া করব, না হয়ত' বেঁধে পুলিশের হাতে দিয়ে খোঁয়াড়ে নির্বাসনে পাঠাব। কিন্তু 'হু ইজ টু বেল দি ক্যাট'? এগুবে কে? ইয়া খাড়া খাড়া ধারাল দুই রামশিঙার মত শিঙ নেড়ে একবার তাড়া করলেই হয়েছে আর কি! শেষ পর্যন্ত কোনটাই কার্যে পরিণত হয়নি।

এমন সময় একদিন কলকাতায় জাপানী বোমার ভয় এলো; চারিদিকে সাজসাজ রব পড়ল। এ. আর. পি. তৈরি হ'ল, দমকলের কাজ বাড়ল, ফাঁকা ফাঁকা জায়গা দেখে মানুষ লুকোবার গর্ত খোঁড়া হ'ল এবং রাস্তাঘাটের এই সব ভবঘুরে মনিবহীন জীবদের জোর ক'রে ধরে বেঁধে দেশান্তরী করার ব্যবস্থা হ'ল। এইবার আর গুণ্ডা যায় কোথা! আমরা বোমার ব্যাপারে সামান্য শঙ্কিত হলেও, এ-ব্যাপারে সকলেই উৎসাহিত হলাম! এখন আর এ-পাড়া ও-পাড়া নয় সব পাড়ারই ঐ এক ব্যবস্থা—'ধর আর মার'-র মত, দেখ আর ধর!

সেদিন মেঘলা ক'রে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল সকাল থেকে। বাসা থেকে দশটা নাগাদ খেয়ে-দেয়ে দোকানের দিকে যাত্রা করলাম। চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে কটন স্ট্রীটের মুখে সব ঢুকেছি, এমন সময় কানে এলো কতকগুলো লোক একসঙ্গে 'গুণ্ডা গুণ্ডা' বলে চেঁচাচ্ছে। সামনের দিকে নজর পড়তেই দেখি, বিশাল সেই দেহ নিয়ে বেশ বেগেই গুণ্ডা প্রাণপণে ছুটে আসছে। এমন ভাবে ছুটতে ইতিপূর্বে তাকে আর কখনও দেখিনি, তাই দেখেই মনে হ'ল আজ বাছাধন নিশ্চয়ই এমন কোন বিপদে পড়েছে, যা থেকে তার আর রক্ষে নেই। এইটুকু ভাবতেই দেখি চক্ষের পলকে গুণ্ডা একেবারে হাওয়া! আর তার বদলে পেছনে আসছে, তারই মত হন্তদন্ত হয়ে দু'তিন জন পুলিশ। হাতে তাদের খেঁটে, পরনে কাপড় ও গায়ে সিপাহীর কোট।

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হ'ল। কিন্তু গুণ্ডা এমন আশ্চর্যভাবে উধাও হ'ল কোথায়! ভাবতে চেষ্টা করলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মনে পড়ল,

হ্যাঁ জায়গা আছে ত'—ওস্তাদ বটে গুণ্ডা! আমাদের দোকানের ঠিক পাশেই যে সরু গলিটা গেছে, আত্মরক্ষার জন্তে তারই মধ্যে নিশ্চয়ই ঢুকে পড়েছে ও।

আমি এগোচ্ছিলাম: রাস্তায় পুলিশদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে 'ও কিধার গিয়া?' কি জানি কেন, হঠাৎ মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'হাঁ হাঁ এই রাস্তা দিয়া বাহির গিয়া।' আমি ভালো হিন্দী জানতাম না, তাই যাহোক ক'রে বুঝিয়ে দিলাম ওদের। কিন্তু আমি ও-কথা বুঝ্‌লে কি হবে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখি, আমাদের পেছন থেকে আরও দু'জন পুলিশ আসছে ঠিক দৌড়ে না হলেও বেশ দ্রুতবেগেই। আমি মজা দেখবার জন্তে তাদের পাশ কাটিয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে গেলাম।

এপাশের দু'জন আর ওপাশের ক'জন পুলিশ মিলিত হতেই তারা বুঝে ফেললে যে, এ-রাস্তা দিয়ে চিৎপুরের রাস্তায় গুণ্ডা বেরোয়নি—মাঝখানেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে। নিশ্চয়। তখন তারা এই রাস্তার মাঝখান থেকে যে দু'একটা গলি বেরিয়েছে তার বিপরীত দিকের মুখগুলি আগলাবার জন্তে দ্রুত বেরিয়ে গেল, বাকী এ রাস্তার মুখ আটকাবার জন্তে দাঁড়িয়ে রইল যে পুলিশটি, তার নাম হচ্ছে পাঁড়ে।

আকারে প্রকারে পাঁড়ে প্রায় আমাদের গুণ্ডা ষাঁড়ের মতই। এমন কিম্ভূত-কিমাকার মোটা বেঁটে পুলিশ কলকাতায় আর আমার নজরে পড়েনি। তাই তাকে দেখছিলাম আর হাসছিলাম এই ভেবে যে, গুণ্ডা যদি তোমায় একবার তাড়া করে, তাহ'লে তুমি কি করবে পাঁড়ে! সে ষাঁড়ের গুঁতোয় গাড়ে যে তোমার ভুব্য গজিয়ে যাবে বাবা!

পাঁড়ে তার চেয়ে হাতখানেক বড় এক লাঠি আর তার বিপুল দেহভার নিয়ে হেলতে-দুলতে এগোচ্ছিল এবং আমিও সেই সঙ্গে এগোচ্ছিলাম দোকানের দিকে—সাময়িকভাবে ঘটনার প্রায় যবনিকাপাত হ'ল দেখে।

কিন্তু হঠাৎ ঘটনার পরিবর্তিত হ'ল, এবং এইখানেই হ'ল আমাদের গল্পের সত্যিকার ক্লাইমেক্স।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গুণ্ডা বোধহয় গলির ভেতর দিয়ে অন্ত চত্তরে সটকে পড়ার চেষ্টা কচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে, সে আবার আগের মতই দ্রুত আমাদের দিকে ছুটে আসছে, আর রাস্তার লোকেরা হুড়মুড় ক'রে সরে যাচ্ছে দু' পাশে।

দোকানদারদের দু' একজন 'পালাচ্ছে পালাচ্ছে' বলে চীৎকার ক'রে

উঠল। আমিও, 'পাঁড়েজী, সরে এসো, ওকে রুখতে যেয়ো না', বলে একটা দোকানের ওপর গুঠে পড়লাম।

কিন্তু পাঁড়ের মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে, সে ওকে রুখবেই। পাঁড়ে বিপুল বিক্রমে রাস্তার মাঝখানে দু' হাতে তার লাঠিটাকে লম্বালম্বি করে পথ আগলালো।

গুণ্ডা খানিকটা দৌড়ে ওর কাছ বরাবর এসেই হঠাৎ যেন থমকে গেল এবং আবার দৌড় দেবে কিনা বোধহয় একবার ভেবে নেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ইতিমধ্যে পেছনে তখন সেই দু'তিন জন পুলিশ এসে গেছে এবং সামনে পাঁড়ে দাঁড়িয়েছে পথ আগলে, লাঠি দিয়ে। কোন্ দিকে এখন সে যায়, কি করে এখন। জায়গাটায় দোকানদার ও পথিকদের বেশ ভিড় হয়ে গেছে তখন। কেউ ঠাট্টা করছে, 'পাঁড়েজী, এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেল ষাঁড়েজীর শিঙটা!' ওধার থেকে অন্য একজন পুলিশ চীৎকার কচ্ছে, 'ছোড়ো মৎ!'

আর দেরী করা অনুচিত ভেবে যেই না পাঁড়েজী দু'পা এগিয়েছে, অমনি গুণ্ডা পেছনের দুটো পা তুলে লাফিয়ে এসে মারলে পাঁড়ের দশাসই ভুঁড়ির ওপর সজোরে এক গুঁতো। বৃষ্টির জলে রাস্তাঘাট পিছল হয়েই ছিল, সেই ধাক্কাই গুঁতো সামলাতে না পেরে পাঁড়ে তার ভুঁড়ি নিয়ে চরিচাপটে চিৎ হয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। একটু দূর থেকেই দেখলাম আমি সব।

কিন্তু একি, গুণ্ডা মাটি থেকে মাথা তুলছে না কেন! তাহ'লে কি সে পাঁড়েকে একেবারেই ঠাণ্ডা করতে চায় নাকি!

রাস্তার লোকেরা হৈ হৈ করে উঠল। ওদিক থেকে পুলিশরাও তখন ছুটে এসেছে। গুণ্ডার গায়ে ডাণ্ডার বাড়ি কে যেন মারলো এক ঘা সজোরে, বোধহয় পুলিশদেরই কেউ হবে একজন। মার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুণ্ডা মাটি থেকে মাথা তুলে লাফিয়েই মারলে ছুট।

সে দৃশ্য ভোলবার নয়। সকলেই গেল গেল ধর ধর করে উঠল, ব্যাপারটা যেমন হাস্যকর তেমনি দুঃখেরও। পাঁড়ে ঝুলছে ষাঁড়ের শিঙে! বিশাল দেহ পাঁড়ের কাপড়-চোপড় প্রায় খুলে গেছে, পা দুটো মধ্যে মধ্যে মাটিতে ঘষড়াচ্ছে কেবল। ইচ্ছে করেই হোক বা গুঁতো মারতে গিয়েই হোক পাঁড়ের কোমরের বগলসের সঙ্গে গুণ্ডার শিঙ গিয়েছে আটকে এবং তাড়ার চোটে, মার খেয়ে তাকে শিঙে ঝুলিয়েই ছুটছে সে। পাঁড়ে কাতর কণ্ঠে 'পাকড়াও পাকড়াও' বলে চীৎকার কচ্ছে, কিন্তু কে কাকে পাকড়াও করে তখন।

বহুলোকে তার পেছনে পেছনে ছুটতে আরম্ভ করল এবং আমিও আর স্থির থাকতে না পেরে উত্তেজনার বশে তাদের অনুগমন করলাম। কেউ বলছে, পাঁড়ের আজ অক্কা হল; কেউ বলছে, ধরলে পুলিশের হাতে ষাঁড়েরও আজ দফা রফা।

চিৎপুর ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে তখন সে এক হাস্যকর বীভৎস দৃশ্য - হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! পুলিশে ষাঁড় ধরতে গিয়ে, ষাঁড়ে পুলিশ ধরেছে ভাবলে হাসি কার না পায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় পুলিশের ঘাঁটিতে খবর যাওয়ায় এক লরি সমেত পুলিশ এসে গুণ্ডাকে পাকড়াও করে ফেল্লে এবং প্রায় দিগম্বর পাঁড়েকে ষাঁড়ের শিঙ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থা তখন তার। তারপর সাত-আটজন পুলিশে বেদম প্রহার দিয়ে গুণ্ডাকে পিচমোড়া করে বেঁধে, পায়ের মধ্যে বাঁশ ঢুকিয়ে তুলে ফেল্লে খোলা লরির উপর। চোখ দিয়ে তখন তার জল গড়িয়ে পড়ছিল, জিভটাও বেশ বেরিয়ে পড়েছিল খানিকটা।

এরপর গুণ্ডার অন্তর্ধানে এ মহল্লার ব্যবসায়ী আমরা বেশ খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম বটে, কিন্তু তবুও তার সঙ্গে যেন কোথায় একটা যোগ ছিল আমাদের। আজ যুদ্ধের বাজারে সে জীবিত কি মৃত সে সম্বন্ধেও বহুকাল কোন সন্ধান পাইনি বটে, কিন্তু তবুও তার জন্যে মনটা মাঝে মাঝে কেমন করে,—মনে হয় বোমা যখন তেমন করে পড়লই না, তখন পুলিশ ওদের হয়ত না ধরলেও পারত।

এও এক রাণী

একালের তুলনায় সেকালের সাধারণ গরীব মানুষের মনও যে কত উঁচু ছিল, তারা যে কত নির্লোভ, কর্তব্যপরায়ণ ও প্রভুভক্ত ছিল তারই একটি সত্য কাহিনী এখানে বলছি।

ঘটনাটি ঘটেছিল সিপাহীযুদ্ধের সময় অযোধ্যাতে, ১৮৫১ সালে। সে সময় অযোধ্যায় একজন উদারপ্রাণ পরোপকারী ইংরেজ ডাক্তার তাঁর স্ত্রী ও ছেলেপুলে নিয়ে বসবাস করতেন। স্থানীয় গরীব লোকদের তিনি ছিলেন বাপ-মা। রোগীর অবস্থা খারাপ হলে অনেক সময় বিনা পয়সায় চিকিৎসা তো করতেনই, তাছাড়া ওষুধপত্র ও পথ্যেরও দাম দিয়ে আসতেন নিজের পকেট থেকে।

তাঁর বাড়িতে একজন ওদেশীয় দরিদ্র মহিলা পরিচারিকার কাজ করত— দেখাশোনা করত তাঁর ছোট ছোট তুটি ছেলেমেয়েকে আয়া হিসাবে। মহিলাটিও ছেলেমেয়েদের ভালবাসত, তেমনি ছেলেমেয়েরাও ভালবাসত তাঁকে। আরো তার নিজের ছেলেমেয়ে না থাকায়, সাহেবের ছেলেমেয়েদের উপর খুবই মায়া পড়ে গেছল তার।

দিন একরকম সবার সুখেই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় ভারতে সিপাহীদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ অসন্তোষ। সেই অসন্তোষ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল এদিক-সেদিকে। বিদ্রোহ দেখা দিল ভয়াবহ রূপ নিয়ে। সিপাহীরা মারমুখী হয়ে উঠল সাধারণ ইংরেজদের উপরেও।

সে সময় অযোধ্যার এই ইংরেজ ডাক্তার-পরিবারটিও খুব ভয় পেয়ে গেলেন। স্থানীয় মুরুব্বী লোকেরা যদিও তাঁকে সাহস দিয়ে বলল যে, তাদের প্রাণ থাকতে তারা তাঁর কোন ক্ষতি হতে দেবে না, কিন্তু তাহলেও, ক্রমশঃ অযোধ্যায় ইংরেজদের অবস্থার এমনই অবনতি ঘটল যে, তাঁদের পক্ষে সেখানে থাকা আর উচিত হবে কিনা, সেই নিয়ে ডাক্তার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বর্ষীয়সী আয়াটি যদিও সে সময় তাঁদের খুবই সাহস দিত এবং বলত, তাঁদের কেউ কোন ক্ষতি করবে না, কিন্তু একদিন সে সাহসও চলে গেল তার আশ-পাশের কানাঘুষো শুনে শুনে। তারা সব বলাবলি করছিল, এখানকার ইংরেজদের সেনানিবাস আক্রমণ করবে বলে!

এ খবর শুনে পাছে সাহেব ও মেম এখান থেকে ভয় পেয়ে চলে যায় এবং ছেলেমেয়ে দুটিও তার কাছ-ছাড়া হয়ে যায়, এই মায়ায় পড়ে ঐ কানাঘুষোর কথা সে আর তুললে না ডাক্তার সাহেবের কাছে।

কিন্তু সে না তুললেও, পরের দিন সেনানিবাস থেকে ডাক্তারের কাছে খবর এল যে, যত তাড়াতাড়ি পারেন, সম্ভব হলে আজই, এই জায়গা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যান অথবা সেনানিবাসে উঠে আসুন সবাইকে নিয়ে।

এরপর আর কোন্ সাহসে কে সেখানে থাকতে পারে? ডাক্তার সাহেব সেদিনই রাতের অন্ধকারে সকলে সেনানিবাসে চলে যাবেন বলে মনস্থ করলেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যতটা পাবেন গোছগাছ করে কিছুটা সঙ্গে নেবেন, আর বাকী যা সবই থাকবে পরিচারিকা লছমীর উপর।

কিন্তু গোছগাছের আর সময় হল না। রাত্রির অন্ধকার একটু ঘন হয়ে আসতে-না-আসতে বিকট কর্ণবিদারী চিৎকারে চমকে উঠলেন ডাক্তার ও ডাক্তারের স্ত্রী। ধড়মড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা। ছেলেমেয়ে দুটি তখন সবেমাত্র শুয়েছে, তুললেন তাদের। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন, সেনানিবাসের দিক থেকে শুধু হই-হল্লাই নয়, প্রলয়ঙ্কর অগ্নিশিখা তার লেলিহান জিহ্বা বার করে অন্ধকারের মধ্যে ছুটোছুটি ফেলে দিয়েছে সেনানিবাসকে ঘিরে। মশাল উচিয়ে কয়েকজনকে তাঁদের বাড়ির

দিকেও যেন ছুটে আসতে দেখলেন তাঁরা! কানে শুনলেন ফটাফট গুলির আওয়াজ।

ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রীর একথা বুঝতে মোটেই দেরি হল না যে, স্থানীয় লোকেরাও সিপাহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সেনানিবাস আক্রমণ করেছে। কাজেই আর দেরি নয়, এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে তাঁদের। গা-ঢাকা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই চলে যেতে হবে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে দূরে কোথাও। সেনানিবাসে যাওয়া আর চলবে না।

সেই ব্যবস্থাই করলেন তাঁরা। লছমীকে কাছে ডাকলেন। গভীর উত্তেজনার মধ্যেই বুঝিয়ে বললেন সব কথা। কি যেন আবেগের কথা বলতে যাচ্ছিল লছমী। তাকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন—অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলে আবার আমরা ফিরে আসব। এ বাড়িতে যা-কিছু রইল, সব তুমিই দেখবে। আর যদি না আসি, যা জিনিসপত্র রইল সব তোমার—তুমি নিয়ো।

কথাগুলো তাড়াহুড়োর মধ্যে বলে, মূল্যবান ও নিত্য ব্যবহারের যা কিছু হাতের কাছে ছিল, যতটা সম্ভব সেগুলির সঙ্গে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা নিঃশব্দে। কোন্ পথে কোথায় যাবেন তা আর ভাঙলেন না। সঙ্গে তাঁদের বিশ্বস্ত আরো তিনজন লোক ঘোড়ার উপর মালপত্র নিয়ে চলে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল লছমী। সে-রাত্রে আর ঘুম এলো না লছমীর চোখে—আসাও স্বাভাবিক ছিল না।

ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল লছমী। শরীর যেন আর বইছে না তার; মন ভেঙে পড়েছে। সব যেন আজ শূন্য তার কাছে। পাগলের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মধ্যে ঘুরতে লাগল লছমী। বাচ্চাদের গাড়ি, খেলনা, জামাকাপড়গুলো দেখে আর চোখে জল উছলে উঠল তার। হাতে তুলে, বুকে চেপে, চুমু খেল সেগুলোর গায়। গোছালো এটা-সেটা। সব গুছিয়ে, যত্ন করে তালা দিয়ে রাখবে সে। অপেক্ষা করবে দিন গুণবে ডাক্তার সাহেব, তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাদের আসার।

হঠাৎ মেমসাহেবের শোবার ঘরের জিনিসপত্র তুলে, ড্রেসিং টেবিলের পাশে খোলা একটা আলমারির মধ্যে কি যেন রাখতে গিয়ে স্কার্ফ-ঢাকা একটা বাক্সে হাত ঠেকে গেল লছমীর। চমকে উঠল সে। এ বাক্স তার দেখা।

এর মধ্যে জুয়েলারি থাকত মেমসাহেবের। তবে কি সেগুলো ঢেলে নিয়ে বাক্সটা ফেলে রেখে গেছেন মেমসাহেব? না, তাহলে এত ভারী হবে কেন এটা! ভয়ে ভয়ে ঢাকাটা খুলেই গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠল লছমীর। সোনা-দানাভরা, হীরে, চুনি, পান্নার গহনার জেল্লায় চোখ ঝলসে উঠল। নেকলেস্ ব্রেসলেট, ব্রোচ, আংটি, পেনডেন্ট ঘড়ি প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসের ডাঁই। কেউ কোথাও নেই তবু এদিক-ওদিক একবার চেয়ে দেখল সে। ভয় পেল, যদি কেউ এখনি এসে পড়ে, এই ঐশ্বর্যের লোভেই এখনি হয়ত তাকে মেরে ফেলবে। সবকিছু ফেলে সেটাকে আপাততঃ একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে এল লছমী।

যথারীতি বেলা বাড়লে অনেকেই এসে উপস্থিত হল ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার সাহেবের চলে যাওয়া নিয়ে নানা জনে নানা কথা তুলল। গত রাত্রের ঘটনায় সকলেই ভয় পেয়ে গেছে। কথার পিঠে কথা উঠতে লাগল সেই সব নিয়ে। সিপাহীরা যেমন লোক খেপাচ্ছে, সাহেব মারছে, তেমনি ইংরেজ-সৈনিকরাও তৎপর হয়ে সে আক্রমণ হিংস্রভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। বাংলার আগুন দিল্লী. আগ্রা, মীরাট, অযোধ্যা, কানপুর ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমান্বয়ে। দু'পক্ষেরই লোক খুন-জখম হচ্ছে চারিধারে—দেশ জুড়ে অশান্তির আগুন! এইভাবে ইংরেজ-রাজকে গদিচ্যুত করার প্রাণপণ চেষ্টা চললো বেশ কিছুদিন ধরে। তারপর আস্তে আস্তে আগুন নিবলো, এলো স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা।

লছমী কিন্তু সেই বাড়িতেই থেকে গেল যক্ষী-বুড়ী হয়ে সাহেব-মেমের সব আগলে। আসলে কোথায় ডাক্তার সাহেব, কোথায় মেম আর কোথায় তাদের ছেলেমেয়ে—কোন খবরই পায় না লছমী। তাঁরা বেঁচে আছেন কিনা তাও জানে না সে। শুধু ভাবে আর ভাবে। কতবার গ্রামের কত লোক লোভ দেখিয়েছে তাকে, ভয় দেখিয়েছে জিনিসপত্র তাদের ভাগ করে দিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু লছমী সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে—দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের।

মেমসাহেবের গহনার বাক্সটি লছমী তার নিজের কাছে রাখেনি—রেখেছে ভাল করে মোটা কাপড় জড়িয়ে বাগানের একপ্রান্তে একটা গাছের তলায় গর্ত খুঁড়ে পুঁতে।

এই সময় একদিন খবর এল তার কাছে যে, ঐ ডাক্তার এখন লখনউ-এর সেনানিবাসে কাজ করছেন, এখানে আর ফিরে আসবেন না। এখান থেকে

যাবার দিন রাত্রে পথেই তাঁর ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী সিপাহীদের হাতে নিহত হয়। তিনি কোনরকমে বেঁচে গিয়েছিলেন।

এই কথা শোনার পর বৃদ্ধা লছমী যেন একেবারে ভেঙে পড়ে। তারপর একদিন এক আত্মীয়কে সঙ্গে করে সে লখনউ-এ ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হয়।

ডাক্তার এই দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ তাকে দেখে অবাক হয়ে যান। তারপর তার কাছে হিন্দীতে সেই ভয়াবহ রাত্রের দুর্ঘটনার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে দুঃখ প্রকাশ করেন। পুরানো পরিচারিকা লছমীর কাছে সব খুলে বলতে তাঁর চোখ জলে ভারী হয়ে ওঠে।

লছমী প্রশ্ন করে,—'আপনি আর ওখানে যাবেন না ?'

উত্তরে ডাক্তার বলেন, 'ওখানে আর গিয়ে কি করব বল ? কে আছে আর আমার ওখানে -কিসের জন্যই বা একলা পড়ে থাকবো ?'

'আপনার জিনিসপত্রগুলো ?' লছমী জিজ্ঞাসা করে।

'ওসব তুমি যা ইচ্ছে করো—নিয়ো নিয়ো। আমি বরং একটা কাগজে তোমায় সব দিয়ে দিলুম বলে লিখে দিচ্ছি।' উত্তরে ডাক্তার সাহেব বললেন।

তখন লছমী আর থাকতে না পেরে তার কাপড়ের পুঁটলীর ভেতর থেকে মেমসাহেব গহনার সেই বাক্সটা বার করে খুলে ধরল সাহেবের সামনে। বলল, 'এটা সেই সময় তাড়াতাড়িতে ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে গিছলেন মেমসাহেব। এটা আমি তুলে রেখে দিয়েছিলুম—পাছে কেউ নিয়ে নেয় সেই ভয়ে পুঁতে রেখে দিয়েছিলুম মাটির তলায়।'

ডাক্তার সাহেব কেমন যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। যে নারকীয় কাণ্ড ঘটে গেল, যে মানুষ জন্তুর চেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখাল নিজেদের. সেই মানুষের মধ্যেই আবার এমন নির্লোভ আত্মত্যাগী দেবীর মত মানুষ আছে, যে এই অতুল ঐশ্চযকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, যার জিনিস তাকে ফেরত দেবার জন্য এই দূর দেশে লোক সঙ্গে করে বহে নিয়ে এসেছে !

তিনি বললেন, 'লছমী তুমি দেবী আছ। এর কিছুটা আমি তোমায় দিচ্ছি, তুমি মেমসাহেবের দান বলে নিয়ে যাও।'

কিন্তু লছমী কিছুই নিল না। সে বললে, 'আমার মেমসাহেব যখন নেই, বাচ্চারা যখন নেই, তখন এসব নিয়ে আমি কি করব ! আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে সাহেব—তোমার হাতে তুলে দিতে পারলুম যে, এই আমার

প্রতি ঈশ্বরের অনেক করুণা। কথাগুলো বলে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল লছমী।

সাহেবের হাতে সেই লক্ষাধিক টাকার গহনার বাক্স তুলে দিয়ে, ফিরে এল আবার অযোধ্যায়। এসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

লছমী যতদিন বেঁচেছিল, ডাক্তার সাহেব প্রতি মাসে তাকে ত্রিশ টাকা করে মাসহারা দিয়ে যেতেন।

আর তার গ্রামের লোকেরা এই ঘটনা শোনার পর থেকে তাকে 'রাণী লছমী মা-ই' বলে ডাকত সকলে।

রহস্যময় ঘর

বিমলদের বৈঠকখানাটা একটু অদ্ভুত ধরণের। প্রথমত, এটা তেতলায়, বাড়ির মধ্যে, অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। সাধারণত, বাইরের আর নীচের ঘরই বৈঠকখানা করার নিয়ম—যেখানে সহজে লোক আস্‌বে, যাবে, বস্‌বে, গল্পগুজব করবে, আড্ডা দেবে। কিন্তু বিমলদের বৈঠকখানার ব্যাপারে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

কেবল বাড়ির ভেতর বলেই নয়, এ-ছাড়াও বৈঠকখানাটার অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। আগা গোড়া বৈঠকখানাটা পুরু কার্পেটে মোড়া, এমনকি পুরু কার্পেটের তলায় তুলোর গদি পাতা আছে বলে যেন সন্দেহ হয়। সমস্ত ঘরটা নিথর, নিস্তব্ধ। পুরু কার্পেটের জন্যে পায়ের শব্দটুকুও হবার যো নেই! কেউ যদি সেখানে আছাড় খায় বা মারামারি করে তবু তার আওয়াজ হবার কোন সম্ভাবনা সেখানেই নেই।

ঘরটা খুব প্রকাণ্ড। খুখ সুন্দরভাবে সাজানো। আরাম-দায়ক কুশন-চেয়ার এবং একধারে একটা সোফাও সাজানো আছে। বাড়ির কর্তার রুচির যতই দৈন্য থাক্, অর্থের অভাব যে সেখানে স্থান পায়নি, প্রত্যেক জিনিসটিই তার সাক্ষ্য দেয়।

সোফায় বসে একটি তরুণ যুবক মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিল। একটা চিঠিই খুব সম্ভব। কিন্তু চিঠিতে তার সমস্ত দৃষ্টি আবদ্ধ থাক্‌লেও কান তার অন্যদিকে সজাগ ছিল বলেই মনে হয়। কেননা, ঘরের বাইরে খুট করে আওয়াজ হতেই, সে চট্ করে চিঠিখানা বুক পকেটে লুকিয়ে ফেললে এবং আলস্যের ভাব দেখিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলে।

একটুখানি পরেই আর একটি যুবক, প্রথমটির চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবে, সেই ঘরে প্রবেশ করল। তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যেন এই মুখর চোখ দিয়েই সে প্রশ্ন করতে চাইছে—তুমি করেছ কি ?

প্রথম যুবকটি দ্বিতীয়টির দিকে তাকাল, তার চোখের মধ্যে যেন উত্তরের ছায়া—তুমি কি জান ? কি জেনেছ তুমি ? দ্বিতীয় যুবকটি সোফায় গিয়ে বসে। প্রথমটির সাম্‌নাসামনি হয়ে। তারপর তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে বলে—রবীন, তুমি আমায় বিষ দিচ্ছ ?

রবীন বলে যুবকটি, সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে ওঠে—তৎক্ষণাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, একটু পেছিয়ে যায়। তার মুখে গভীর ভীতির ছায়া দেখা দেয়, ঠোঁটে প্রতিবাদ এগিয়ে আসে। সে ওঠবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তখন দ্বিতীয় যুবকটি তার সবল বাহু দিয়ে তাকে বেশ জোরেই চেপে রেখেছে। আবার সে প্রশ্ন করে এবং এবারকার প্রশ্নের ভাবার্থ আরও পরিষ্কার, ভাষা আরও গম্ভীর।

—রবীন, কেন তুমি আমায় বিষ দিচ্ছ ?

—তুমি পাগল হয়েছ বিমল, পাগল!—দম নিতে নিতে রবীন উত্তর দেয়।

বিমল তখন একটা ছোট্ট শিশি বার করে—রবীনের চোখের ওপর তুলে ধরে।

—তোমারই ব্যাগ থেকে।

রবীন কয়েক বার কথা বলবার চেষ্টা করে—কিন্তু পারে না। তার মুখ তখন বিবর্ণ, পাংশু, কি রকম যেন হয়ে গেছে। অবশেষে, খুব ধীরে ধীরে তার গলা থেকে মাত্র এ ছাড়া আর কিছুই বেরয় না—আমি কিন্তু ওর ব্যবস্থা করিনি।

বিমল আবার নিজের পকেটে হাত পুরে দিয়ে, একখানা কাগজ টেনে বার করে। ভাঁজ খুলে কাগজখানা রবীনের চোখের সামনে সে মেলে ধরে।

—এক ডাক্তারের ব্যবস্থা করা আর্সেনিকের একটা প্রেস্‌ক্রপ্‌সন্। যে-ওষুধের দোকান থেকে তুমি তৈরী করে এনেছ তার সাক্ষ্যও আমি পেয়েছি।

তারপর, রবীনের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। আর বলবার কিছু নেই তার। অসহায় অপলক দৃষ্টিতে সে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে খালি।

—কি বলতে চাও তুমি ? বিমল প্রশ্ন করে।

রবীন একটু নড়ে-চড়ে কেবল, কোন জবাবই তার দেবার নেই।

—কেন ?—এবার বিমল চেঁচিয়ে ওঠে,—কেন, আমি জানতে চাই, কেন ?

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে রবীনের বুক পকেটে, চিঠির একটা কোণ উঁচু হয়েছিল, সেইদিকে সে এগিয়ে যায় এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তে, ছোঁ মেরে তুলে নেয় সেখানা।

রবীন চীৎকার করে ওঠে। চিঠিখানা ছিনিয়ে নেবার বৃথা চেষ্টা করে। বিমল এক হাতে ওকে আটকে রেখে,—সঙ্গে সঙ্গে চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে যায়।

—কিরণ!—তার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।—শেষকালে কিনা কিরণ!

এতক্ষণে রবীন তার কিছু সাহস যেন ফিরে পায়। আর লুকোবার কিছুই নেই; সবই ধরা পড়ে গেছে। তার মুখের রেখাগুলো কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পায় তীক্ষ্ণতা।

—হ্যাঁ, কিরণই। রবীন জবাব দেয়।

—হায় ভগবান! এত লোকের মধ্যে কিরণ! কিরণ কিনা—

আর বেশি বলতে পারে না বিমল। জোরে জোরে ঘরের চারিধারে পায়চারি সুরু করে। তার মুখের দিকে তাকান যায় না তখন।

কিছুক্ষণ এইভাবে পায়চারির পর যেন সে ঠাণ্ডা হয়। আবার সোফার কাছে এসে দাঁড়ায়।

—দেখো রবীন, তোমাদের সবাইকে আমিই জোগাড় করেছি। এ-দল আমারই হাতে-গড়া। তাছাড়া এও তোমরা জান যে, আমার বুদ্ধি ছাড়া, আমার প্ল্যান ব্যতীত, কিছুতেই এতগুলি বড় বড় কাজ এমন কৃতিত্বের সঙ্গে করতে পারতে না, এবং পুলিশের নজর এড়িয়েও থাকতে পারতে না এতদিন। তোমরাই আমাকে বড়্দা বলেছ, আমার হুকুম মেনে চলেছ; আজ আবার তোমরাই আমাকে সরাতে চাও কেবল বড়দার আসন থেকে নয়, পৃথিবী থেকেও। আর তাদের মধ্যে বোধহয় শ্রেষ্ঠ অংশই নিয়েছ তুমি আর কিরণ—যাদের আমি সবচেয়ে ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি এবং বন্ধু ভেবেছি—

রবীনের উত্তর দেবার কিছুই ছিল না। কাঠের পুতুলের অবস্থা তখন তার।

—কিরণ দলপতি হতে চায়, বুঝেছি। বেশ তাই হবে, তোমরা তাই চাও যদি।—বিমল বলে চলে,—কিন্তু তার আগে তোমরা ভেবে স্থির কর সে তোমাদের ঠিক চালিয়ে নিতে পারবে কি, না, আমি যেমন তোমাদের চালিয়ে এসেছি এতদিন। আমি তোমাদের সর্দারি ছেড়ে দেব—

—সর্দারি ছেড়ে দেবে?—রবীন বিস্মিত কণ্ঠে বলে।

—চাই কি—চাই কি- ছেড়েও চলে যেতে পারি।—বিমল উত্তর দেয়। বন্ধুত্বই পৃথিবীতে বড় জিনিস, নিয়মনিষ্ঠাই আমাদের আদর্শ; ঐশ্বর্য প্রভুত্ব এ-সব তার কাছে কতটুকু। সেই বন্ধুত্বের দাবীই যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে হারিয়েছি, তখন আর বেঁচে থাকার সার্থকতা কি!

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রবীন। কিছুতেই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার মনে হয়, এ-লোকটিকে এতদিন তারা যথার্থ চিনে উঠতে পারেনি।

—বিমল, ভাই তুমি ক্ষমা কর আমায়।

বিমল তার দিকে চেয়ে একটু হাসে। ছেলে মানুষ!

এমন সময় একটা চাকর ঘরে এসে ঢোকে। নিঃশব্দ পায়ে। বিমলের দিকে চেয়ে বলে—কিরণ বাবু এসেছেন।

—কিরণ বাবু! তাকে যেতে বলে দাও।—রবীন চেঁচিয়ে ওঠে।

—না না। নিয়ে এস তাকে। এই মুহূর্তেই সব হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। রোদে ঝলসানো তার মুখ, উজ্জ্বল তার চোখ, গায়ে একটা খদ্দরের হাফ্‌সার্ট। হাসতে হাসতে সে এগিয়ে আসে, কিন্তু আর দুজনের মুখের চেহারা দেখে, তৎক্ষণাৎ তার হাসি যেন উবে যায় এক নিমেষে। একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে সে চাইতে থাকে, তারপর, একটু ইতস্তত করে সে জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপার কি হে তোমাদের?

বিমল এগিয়ে ওর ঘাড়ের ওপর একখানা হাত রাখে—তোমার ওপর কোন রাগ নেই আমার।

—রাগ? মানে?

—অর্থাৎ, আমি সব জানতে পেরেছি। সমস্তই। তবে, দোষ আমি তোমাকে দিই না। এইটাই হয়ত স্বাভাবিক! দলপতিত্বের মোহ এমনি যে, তোমার অবস্থায় আমিও হয়ত এই করতাম।

কিরণ যেন কিসের একটা ভীষণ ধাক্কা খেয়ে, সাত হাত পেছিয়ে যায়। সে চায় রবীনের দিকে। রবীন ঘাড় নাড়ে। বিমল হাসে।

—তোমার কোন ভয় নেই কিরণ! দলের দলপতি কে হবে, তুমি না আমি এই মুহূর্তেই এখানে তা' স্থির হয়ে যাক্। এই দেখ একটা ছোট শিশি! কি আছে এতে বুঝতেই পারছ। আমাদের একজন এটা নিঃশেষ করলেই সব হাঙ্গামা চুকে যায়।—বিমলের ভাবভঙ্গী কেমন যেন কঠিন হয়ে ওঠে। রবীন, তুমিই ঠিক করো, আমাদের মধ্যে কে এটা খাবে?

সেই সময়, সেই ঘরের মধ্যে ওরা তিনজন ছাড়াও আর একজন মানুষ ছিল। একটা বড় ড্রেসিং টেবিলের পাশে, কালো পর্দার আড়ালে নিজেকে একেবারে গোপন করে। কতক্ষণ ধরে যে সে ওখানে স্থান নিয়ে, ওভাবে আছে কেউ জানে না। জীবনের সন্ধি-ক্ষণে দাঁড়িয়ে, ওদের তিনজনের কারুরই সেদিকে লক্ষ্য করবার অবসর হয়নি।

সে কিন্তু এই অদ্ভুত নাটকের, প্রত্যেক বিষয়টিই, বেশ খুঁটিয়ে, একান্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখে যাচ্ছিল। এইবার তার মনে হল, তার সত্যিকারের বাধা দেবার সময় এসেছে। আর দেরি করলে সব পণ্ড হতে পারে।

লোকটা কি পুলিশের? কে জানে!

বিমল জিজ্ঞাসা করে—কেমন কিরণ, রাজি তো?

কিরণ ঘাড় নাড়ে।

—ভগবানের দোহাই! না—না!—চীৎকার করে ওঠে রবীন।

বিমল শিশিটার ছিপি খুলে ছোট একটা টিপয়ের ওপর রাখে। তারপর মণিব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে বলে—টস্ করেই ঠিক করা যাক্। হেড্-না-টেল?

বিমল টাকাটা ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়—

এমন সময়, কালো পর্দাটা সরে যায়। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সেই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তি। তার মুখে গাম্ভীর্যের ভাব।

তিনজনেই তখন তার উপস্থিতি টের পায়। তিনজনেই সাগ্রহে তার দিকে তাকায়।

চতুর্থ লোকটির মুখের ভাব বিরক্তিজনক ও বিষণ্ণ।

—কি রকম হ'ল? তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে।

—যাচ্ছে তাই! লোকটি জবাব দেয়। একদম বাজে, কিচ্ছু হয়নি। কাল আবার গোড়া থেকে সমস্ত রীলটাই তুলতে হবে।

শহরে আর জঙ্গলে

তোমরা ত' অনেক দেশেরই মজার মজার সব রূপকথা শুনেছ। রূপকথার মধ্যে পরী-হুরী থাকে, রাক্ষস-খোক্ষস থাকে; জীবজন্তুরা সেখানে মানুষের মত কথা বলে, আর মজার মজার কাণ্ড ঘটায়। রুশ দেশেও এমনি অনেক মজার মজার রূপকথা লেখা হয়েছে। আজ এখানে রুশ দেশের একটি মজার তোমাদের বলছি শোন।

একবার এক জঙ্গলে এক শিকারী শিকারে গিয়ে তাঁর কুকুরটি হারিয়ে আসেন। গহন বনের মধ্যে একটি শূকরের পিছনে তাড়া করে শিকারীর ঐ কুকুরটি আর ফেরে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন তার সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন শিকারী ভাবলেন, নিশ্চয়ই সে অন্য কোন হিংস্রজন্তুর পেটে গেছে। ক্রমে বনের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে আসেন তিনি।

আসলে কুকুরটি কিন্তু মরেনি। শূকরের পিছনে ছুটতে ছুটতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে পথ হারিয়ে ফেলে। অনেক ঘোরাঘুরি করেও ঠিক সময়ে আর তার প্রভুর কাছে এসে পৌছতে পারে না। বাধ্য হয়ে কুকুরটিকে ঐ বনের মধ্যেই থেকে যেতে হয়। কুকুরটির নাম সীজার। একদিন যায়, দু'দিন যায়, নিদারুণ কষ্টে-শুকনো ডালপাতার উপর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে শুয়ে কোন রকমে রাত কাটায় সীজার, আর দিনের বেলায় সারা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় তার মনিবকে। মনের দুঃখে আর দুর্ভাবনায় খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত যেন ভুলতে বসে। তাছাড়া শহরের মনিববাড়ির মত এখানে খাওয়া-দাওয়াই বা পাওয়া যাবে কোথা! এই জঙ্গলের মধ্যে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে আর

পোকা-মাকড়ের কামড় খেয়ে, ক'দিনের মধ্যেই সীজারের অবস্থা একেবারে 'সসেমিরে' হয়ে ওঠে।

পেটের জ্বালা সবচেয়ে বড় জ্বালা, খেতে না পেলে মানুষই যা তা করে বসে তা' জন্তু। ক্রমশঃ বেচারা সীজারের প্রাণ ত' যায় যায় অবস্থা। এ বনে না আছে একটা খরগোশ, বেজি বা গেছো-ইঁদুর যা ধরে খেয়ে প্রাণ বাঁচান যায়! ক্রমশঃ তার অবস্থা যখন খুবই কাহিল, বেশী আর নড়াচড়াও করতে পারছে না, ঠিক সেই সময় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক শেয়ালের। শেয়াল প্রথমটা ঐ শহুরে বনেদী কুকুরকে দেখে তার দিকে ঘেঁষতে চায়নি, কিন্তু সীজারই তাকে ডেকে কথা বললে। বিনীত ভাবেই বললে, "ভাই শেয়াল, আমি পথ হারিয়ে ক'দিন এখানে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মরতে বসেছি, তুমি যদি ভাই আমাকে একটু পথ দেখিয়ে এই বনের বার করে দাও, তা'হলে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।"

শেয়াল কথাটা শুনে একটু হাসলে। হেসে বললে, "তোমরা শহরের জীব এখানে কষ্ট হবে বইকি!"

সীজার বললে, "তোমাদের বনের কথা আর বলো না ভাই, এখানে না আছে কিছু খাবার, না থাকবার জায়গা!"

শেয়াল বললে, "তা যা বলেছ ভাই—এই দিকটাতেই আর কিচ্ছু পাওয়া যায় না। দেখছ না, না খেতে পেয়ে আমার কিরকম হাড় বেরিয়ে গেছে!"

—"তা ত' দেখছি, কিন্তু তা'হলে কি সুখে এখানে পড়ে আছ?"

—"কোথায় যাব বলো?—পাশের জঙ্গলে বড় বড় জানোয়াররা থাকে, সেখানে আমাদের ঢোকবার অধিকার নেই, আর ঢুকলেই মেরে ফেলবে!"

শেয়ালের দুঃখের কথা শুনে সীজার বললে, "তার চেয়ে তুমি চলো আমার সঙ্গে শহরে। সেখানে মজাসে থাকবে, খাবে-দাবে আর কতকি দেখবে!" বলে সীজার শহরে তার ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়া, আরামে থাকা ও প্রভুর আদর-আপ্যায়নের কথা ফলাও ক'রে বর্ণনা করলে।

শেয়াল বললে, "তবে যে শুনেছি শহরের মানুষেরা খুব খারাপ; তাদের এতটুকু দয়া-মায়া নেই, তারা কথায় কথায় লোককে ঠকায় আর মিথ্যে বলে!"

—"ওসব যা শুনেছ, সব বাজে কথা। তুমি চলো আমার সঙ্গে, ক'দিন থেকে এলেই বুঝবে। আমার আরামের ব্যবস্থা দেখলে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে!" সীজার বললে।

কুকুরের সব কথা শুনে শহরে যাবার জন্যে মনে মনে শেয়ালের লোভ হতে

লাগলো। আর এসব কথা শোনার পর কার না ইচ্ছে হয় বলো শহরে যেতে? কে চায় এই অন্ধকার গহন বনে এমনভাবে পড়ে থাকতে? তবু শেয়াল দুঃখু করে বললে, "আমি ত' ভাই মানুষের কোন কাজে লাগবো না, তার উপর বুড়ো হয়েছি, আমাকে তারা তোমার মত যত্ন করে রাখবে কেন?"

—"আরে শহুরে মানুষের সখের ত' তুমি খোঁজ রাখ না, তাই এ-কথা বলছ; তারা বাঘ, সিংহী, হাতি, ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে টিকটিকি গিরগিটি পর্যন্ত পুষে থাকে। তাছাড়া তুমি ত' আমার অতিথি হয়ে যাবে, ভয়টা কিসের?"

আসলে কুকুর কোন রকমে তখন শেয়ালকে দিয়ে বন থেকে বেরুবার পথটা দেখে নিতে চাইছিল।

এরপর শেয়াল রাজী হয়ে গেল সীজারের সঙ্গে শহরে যেতে।

সেদিন সন্ধ্যার দিকেই কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে শেয়াল শহরে যাবার জন্যে যাত্রা করলে। বন-বাদাড়ের পথ পেরিয়ে চলতে লাগল তারা দু'জনে। রাত থাকতে থাকতেই তাদের শহরে গিয়ে পৌঁছতে হবে। অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর তারা দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কুকুর বললে, "ভাই শেয়াল, আর কতটা পথ বাকী আছে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে আসতে?"

—"আর বেশী দেরি নেই, মনে হচ্ছে এখন আমরা জঙ্গলের শেষ সীমানায় এসে পড়েছি।" শেয়াল বললে।

একে আগে থেকেই শেয়ালের শরীর ভাল ছিল না, তার উপর পথ-চলার ক্লান্তিতে আর খিদের জ্বালায় শেয়ালের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল। তবু একবার কোন রকমে শহরে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তার আর কোন দুঃখ থাকবে না, এই আশাতেই চার পায়ে ভর দিয়ে সীজারকে সে বনের প্রায় বাইরে নিয়ে এসে ফেললে। বনের বাইরে এসে পড়ার মুখে দূর থেকে তাদের চোখে পড়ল এক চাষীর বাড়িতে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। আলো দেখে সীজারের আর আনন্দ ধরে না। খিদে-তেষ্টায় সে-ও ক্লান্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু তবুও দ্রুত পা-চালিয়ে শেয়ালকে প্রায় ফেলেই সে এগিয়ে যেতে লাগলো।

এই দেখে শেয়াল দুঃখু করে বললে, "ভাই সীজার, এর মধ্যেই তুমি যখন আমাকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছ, তখন শহরে গিয়ে আবার চিনতে পারবে ত'?"

—"কী যে বলো বন্ধু! আমি একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখছি যে বাড়িটায় আলো জ্বলছে, তার আশেপাশে কিছু খাবার পাওয়া যায় নাকি।"

এই কথা বলে সীজার এগিয়ে যেতে লাগলো আর শেয়াল চলতে লাগলো তার পেছনে পেছনে। এতক্ষণ পথ দেখিয়ে আনার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে সব সময় শেয়াল ছিল আগে,—এখন সে পেছনে আর সীজার তার আগে।

ধুঁকতে ধুঁকতে চাষীর বাড়ির কাছে শেয়াল যখন এসে পৌছল, তখন কুকুর চাষীর রান্নাবাড়ির আশেপাশে যা পড়েছিল চেটেপুটে খেয়ে আরামে শুয়ে শুয়ে মুখ পুঁচছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও শেয়াল কুকুরকে জিজ্ঞেস করলে, "কী ভাই, চাষীর বাড়ির আনাচে-কানাচে কিছু খাবার-দাবার পেলে নাকি?"

—"কোথায় কি পাবো!" বললে সীজার।

ডাহা মিথ্যে বললে যে সীজার তা বুঝতে আর বাকী রইল না শেয়ালের। বুদ্ধিতে শেয়ালও ত' কিছু কম যায় না! সে বললে "তাহলে এখন কি উপায়?"

—"উপায় আর কি একটু বিশ্রাম করে নিতে হয় নাও, তারপর আবার চলো।"—বেশ উদ্ধতভাবেই কথাগুলো বললে সীজার। এখন আর তার সেই আগের শান্ত নম্র মেজাজ নেই।

ঠিক এমনি সময় চাষীর বাড়ির ভিতর থেকে একটি কোলের বাচ্চা ছেলে বিকট কান্না শুরু করলে। চাষী-বৌ নানাভাবে তার কান্না থামাতে না পেরে রেগেমেগে বললে, "এবার যদি তুই কাঁদিস, তা'হলে তোকে নিশ্চয়ই বাইরে ফেলে দেবো শেয়ালের মুখে!"

একথা শুনে শেয়ালের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, মনে আশায় সঞ্চার হলো। সে সীজারকে বললে, "শুনলে, ছেলেটা যদি আবার কাঁদে তা'হলে চাষী-বৌ বাচ্চাটাকে আমাদের ভোজে দিয়ে দেবে বলছে!"

—"তুমিও যেমন বোকা, কান্নার জন্যে বাচ্চাকে কেউ কখনো শেয়ালের পেটে দেয় নাকি!"

—"তবে যে বলছে?"

—"বলছে মিথ্যে করে, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে—মাথায় এটুকুও বুদ্ধি নেই শেয়ালপণ্ডিত!"

—"অতটুকু বাচ্চাকে মা মিথ্যে ব'লে ভয় দেখাচ্ছে!" আশ্চর্য হলো শেয়াল।

—"জঙ্গলের ভূত এটুকুও মাথায় ঢোকেনি!" স্রেফ গালমন্দ দিতে লাগলো শেয়ালকে কুকুর।

বাচ্চার কান্না ইতিমধ্যে সাময়িকভাবে থেমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই তারস্বরে সে আবার কান্না শুরু করে দিলে। চাষী-বৌ তখন তাকে আবার ভোলাতে লাগলো এই বলে যে, "না না, তোমায় মিথ্যে করে বলেছিলুম শেয়ালের মুখে দেব—আর কেঁদোনা বাছা আমার—শেয়ালকে কি তোমায় দিতে পারি!···আসুক না শেয়াল, তাকে মেরেই ফেলব না!"

সাঁজার তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, "কি, শুন্‌লি ত' বোকারাম! নে, এখন যাবি ত' ওঠ, নয়ত পালা এখান থেকে—ভোর হয়ে আসছে, বাইরে আসবে চাষী-বৌ!"

শেয়াল সব শুনছিল চুপচাপ করে। সাঁজারের কথার ভাবভঙ্গী আর শহরে পৌঁছবার আগেই সহরতলীর মানুষের মিথ্যাভাষণের যে নমুনা পেল সে, তাতে কুকুরের সঙ্গে শহরে যাবার আগ্রহ আর তার রইল না। কুকুরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও ঘৃণা বোধ হলো তার। আস্তে আস্তে চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল শেয়াল। তার পর টলতে টলতে জঙ্গলের দিকে মুখ করে চলতে লাগল—সেই চির-পরিচিত জঙ্গলেই তার সবচেয়ে সুখের আস্তানা—সেখানেই ফিরে যাবে শেয়াল।

অনুরোধ

ভালবাসো নিজ দেশ
পারো নিজেদের বেশ
কথা কও নিজেদের ভাষাতে।
পায়জামা বুশ্‌সার্ট
হতে পারে ফিট্‌ফাট্‌
পরো না তা বিদেশীকে হাসাতে।
পোশাকে প্রথম হয়
সকলের পরিচয়—
কোন্‌ জাত্‌, কোন্‌ দেশে বাড়ী বা
ইংরেজ, আফগান,
চীনে বাড়ী, না জাপান,
বাঙালী, বেহারী, মাড়োয়ারী বা!
তারপর পরিচয়
কি ভাষায় কথা কয়;
জাত চেনা যায় ভাষা শুনে তো!
তারপরে আচরণে
ছাপ রেখে যায় মনে
শেষ পরিচয় জ্ঞানে গুণে তো।
আমরা যে ভারতীয়
সেই পরিচয় দিও
মুখের কথায় আর সাজেও।
নকলে হয়ো না মাটি
সব দিকে হও খাঁটি
উৎসবে, আনন্দে, কাজেও।

মিষ্টি ছেলে

"ও দাদা—ছেলেটা ভাই তোমার কি যে মিষ্টি !"

"ও ভাই—ছিল বটে মিষ্টি অতি
লেখা পড়ায় ছিল মতি
দয়া ছিল আর্তজনে
ধর্মে ছিল আস্থা মনে
ভক্তি ছিল গুরুজনে
ভারতের যা কৃষ্টি।

কিন্তু ব্রাদার, সৃষ্টি ছাড়ার
জুটলো যত ছোঁড়া পাড়ার
ভাসিয়ে দিল
ঘুলিয়ে দিল
ভুলিয়ে দিল
—যতেক ছিল—

(সত্যি ছিল ছেলেটা ভাই মিষ্টি !)
বড় হয়ে, বড় কিছু করবে নবসৃষ্টি।
এখন দেখি করে বেড়ায়, শুধু অনাসৃষ্টি !"
(হায় রে ছেলে ! এই তো সেদিন, তুই-ই ছিল মিষ্টি !)

"হ্যাঁ দাদা—তাহলে তো দুঃখ তোমার অতি
এমন ছেলের শেষে এমন গতি !"

"ও ভাই—ওষুধ কিছু আছে জানা ?
কিম্বা কিছু এমন মানা—
ভাল হবার সম্ভাবনা—
যাতে করে আবার আসে ফিরে ?"

"হ্যাঁ দাদা,—আছে ওষুধ পুরাকালের
ভূত ছাড়ে তার ইহকালের
প্যাঁদানী তার নাম ;
দাদা, শূন্য করে দুষ্টু গরুর যতেক গোয়ালধাম।"

"হ্যাঁ ভাই—ঠিক বলেছ, কাটবে এতেই যতেক গ্রহরিষ্টি
ধন্য ব্রাদার, মাথায় তোমার নামুক পুষ্পবৃষ্টি !"
(বলো ভাই, ছেলেরা হোক আগের মত সবাই যেন মিষ্টি !) ৮